Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর অধিকার বনাম নারীবাদ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া আক্তার নাছিমা

রোলঃ 23100120818

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর অধিকার বনাম নারীবাদ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া আক্তার নাছিমা

রোলঃ 23100120818

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে নারীর অধিকার বনাম নারীবাদ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া আক্তার নাছিমা, আইডিঃ 23100120818 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে নারীর অধিকার বনাম নারীবাদ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুমাইয়া আক্তার নাছিমা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সুমাইয়া আক্তার নাছিমা

আইডিঃ 23100120818

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় 5

ভূমিকা (Introduction) 5

দ্বিতীয় অধ্যায় 10

নারীবাদ : ধারণা, ইতিহাস ও প্রকারভেদ 10

তৃতীয় অধ্যায় 33

বিভিন্ন ধর্মে নারীদের অবস্থান 33

চতুর্থ অধ্যায় 56

ইসলামে নারীর অধিকার 56

পঞ্চম অধ্যায় 119

ইসলামে নারীর অধিকার বনাম নারীবাদ এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ 119

ষষ্ঠ অধ্যায় 133

সমকালীন বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট ও ওহীর চিরন্তন সমাধান 133

সপ্তম অধ্যায় 138

সুপারিশমালা (Recommendations) 138

উপসংহার (Conclusion) 140

তথ্যসূত্র 141

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা (Introduction)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ।

১.১গবেষণার পটভূমি (Background of the Research)

মহাবিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, হুকুমদাতা, আইনপ্রণেতা এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানবজাতির হেদায়েত ও চূড়ান্ত মুক্তির জন্য একটি শাশ্বত জীবনবিধান অবতীর্ণ করেছেন। ইসলাম কেবল কোনো প্রচলিত প্রথাগত ধর্মের নাম নয়, বরং এটি মানুষের সামগ্রিক জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ ও ইনসাফভিত্তিক ঐশ্বরিক রূপরেখা। এই সত্য ঘোষণা করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন__

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

ط

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম।" — (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন __

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থ: “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।” — (সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৩)
যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন, তাই মানবজীবনের সামষ্টিক ও ব্যক্তিক পরিমণ্ডলের কোনো অংশই এর বাইরে নয়। মানব রচিত যেকোনো মতবাদ বা দর্শন সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত ও ত্রুটিযুক্ত প্রমাণিত হয়। তাই ইসলামের বাইরে অন্য কোনো আদর্শ বা জীবনচর্যা গ্রহণ করলে তা কখনোই মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা কঠোরভাবে হুঁশিয়ারি দিয়ে ঘোষণা করেছেন:

وَ مَنۡ يَّبۡتَغِ غَيۡرَ الۡاِسۡلَامِ دِيۡنًا فَلَنۡ يُّقۡبَلَ مِنۡهُ ۚ وَ هُوَ فِى الۡاٰخِرَةِ مِنَ الۡخٰسِرِيۡنَ

অর্থ: "আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন বা মতবাদ তালাশ করবে, তা কখনোই তার কাছ থেকে কবুল করা হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" — (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫)

যেখানে সমাজের প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের সমাধান আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেখানে মানবদেহের ও সমাজের অর্ধেকেরও বেশি অংশ জুড়ে থাকা নারীর অধিকার ও সামাজিক অবস্থান উপেক্ষিত থাকবে—এমনটি ভাবা অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসেবে সমাজে কার কী অধিকার থাকবে, তা নির্ধারণের নিরঙ্কুশ অধিকার একমাত্র আল্লাহর, মানুষের তৈরি কোনো ত্রুটিপূর্ণ মতবাদের নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর আইন ও বিধান চলার অপরিহার্যতার ব্যাপারে বলেছেন__

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

অর্থ: "আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও বিধান দেওয়ার বা হুকুম জারী করার অধিকার নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত (ও আনুগত্য) করবে না।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০)
সৃষ্টি যার—আইন ও বিধানও চলবে একমাত্র তাঁরই। এই সৃষ্টিতাত্ত্বিক ও আইনি সমতার আলোকেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নারী ও পুরুষকে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সৃষ্টি করেননি, বরং সমাজ ও পরিবারকে সচল রাখার জন্য তাদেরকে একে

অপরের পরিপূরক ও সহায়ক হিসেবে তৈরি করেছেন। মানব সৃষ্টিতত্ত্বের এই অনন্য ভারসাম্যের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন__

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, এবং তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান (আল্লাহভীরু)।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩)

বিশ্বের এই পরিবর্তনের হাওয়ায় বর্তমান আধুনিক সমাজে নারীর আত্মমর্যাদা, অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী আদর্শ মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। একদিকে রয়েছে মহান স্রষ্টার দেওয়া শাশ্বত জীবন বিধান 'ইসলামে নারীর অধিকার' এবং অন্যদিকে রয়েছে মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত ও ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা দর্শন 'নারীবাদ' (Feminism)। আপাতদৃষ্টিতে দুটি বিষয়কেই নারী কল্যাণের কথা বলতে দেখা গেলেও, এদের মৌলিক ভিত্তি, লক্ষ্য, এবং চিন্তাধারার মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান ।

পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ নারীবাদ গড়ে উঠেছে মূলত তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজের পুরুষতান্ত্রিক নির্যাতন, চার্চের একপেশে নিয়ম এবং চরম নারী অবমূল্যায়নের প্রতিক্রিয়া হিসেবে। এই মানবসৃষ্ট মতবাদটি নারী মুক্তির নামে পারিবারিক কাঠামোকে ভেঙে ফেলা, লৈঙ্গিক বৈচিত্র্যের সীমানা লঙ্ঘন করা এবং খোদ ধর্মীয় অনুশাসনকেই নারী অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে এই পশ্চিমা সেক্যুলার চিন্তাধারার অন্ধ অনুকরণে এক শ্রেণীর মানুষ ইসলামের ইনসাফভিত্তিক নারী অধিকারকে আধুনিক নারীবাদের মাপকাঠিতে পরিমাপ করতে চাচ্ছে, যা মুসলিম সমাজের আকিদা, পারিবারিক ঐতিহ্য এবং শরিয়তের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

এর বিপরীতে, আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে যখন পৃথিবীর বুক থেকে নারীর বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তখন ইসলাম অবতীর্ণ হয়ে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তনটি এনেছিল। ইসলাম নারীকে পুরুষের প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী বানায়নি, বরং পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের মাধ্যমে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইসলাম অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহর দরবারে নারী ও পুরুষ উভয়ের আত্মিক মর্যাদা সমান এবং মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মানদণ্ড হলো তার অন্তরের তাকওয়া বা খোদাভীতি, কোনো নির্দিষ্ট লিঙ্গ বা গায়ের রং নয়।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিলের মাধ্যমে ইসলাম নারীর জীবন, শিক্ষা, সম্পত্তি, মিরাস (উত্তরাধিকার), মোহরানা এবং সামাজিক নিরাপত্তার এমন এক অখণ্ড আইনি বলয় তৈরি করেছে, যা পৃথিবীর কোনো মানবসৃষ্ট দর্শন বা আধুনিক আন্দোলন কখনোই দিতে পারেনি এবং পারবেও না। সুতরাং, পশ্চিমা নারীবাদের অসারতা ও সংকটগুলো চিহ্নিত করে ইসলামের ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ নারী অধিকারের প্রকৃত রূপটি বর্তমান বিশ্ববাসীর সামনে অ্যাকাডেমিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে তুলে ধরাই এই গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ইসলামে নারীর অধিকারের বহুমাত্রিক রূপ এবং আধুনিক নারীবাদের তাত্ত্বিক কাঠামোর একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ দাঁড় করানো। সুনির্দিষ্টভাবে গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- ইসলাম পূর্ব জাহেলি সমাজ এবং বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায় নারীর মানবিক ও আইনি অবস্থানের চিত্র তুলে ধরা।

- আধুনিক নারীবাদের ঐতিহাসিক উৎপত্তি, এর বিভিন্ন তরঙ্গ (Waves) এবং প্রধান উপধারাগুলোর তাত্ত্বিক দিক পর্যালোচনা করা।

- পবিত্র কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে নারীর আধ্যাত্মিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক ও আইনি অধিকারসমূহ বিশদভাবে উপস্থাপন করা।

- নারীবাদী দর্শন এবং ইসলামি পারিবারিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যকার মৌলিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যসমূহ মূল্যায়ন করা।

- সমকালীন বিশ্বের বাস্তবতায় নারীর সামগ্রিক নিরাপত্তা ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কোন দর্শনটি অধিক কার্যকর ও টেকসই, তা নিরূপণ করা।

১.৩ গবেষণার পরিধি (Scope of the Study)

এই গবেষণার পরিধি মূলত পবিত্র কুরআন, সহিহ হাদিস, নির্ভরযোগ্য তাফসির ও ফিকহ গ্রন্থ এবং নারীবাদের প্রধান তাত্ত্বিক লেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এখানে নারীর অধিকার ও পারিবারিক কাঠামো সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং অপ্রমাণিত উৎস বা ব্যক্তিগত মতামত পরিহার করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণার গুরুত্ব (Significance of the Study)

বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ইসলাম এবং আধুনিক নারীবাদের মধ্যে ব্যাপক বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক বিদ্যমান। একদিকে পশ্চিমা নারীবাদ নারীর মুক্তি ও সমতার দাবি উত্থাপন করছে, অন্যদিকে ইসলামের ইনসাফভিত্তিক নারী অধিকারকে বিভিন্নভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর ফলে মুসলিম সমাজের একটি অংশ বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে এবং ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি হচ্ছে।

এই গবেষণার গুরুত্ব হলো—পবিত্র কুরআন ও সহিহ সুন্নাহর আলোকে নারীর প্রকৃত মর্যাদা, অধিকার এবং সামাজিক অবস্থানকে একাডেমিক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা। একইসঙ্গে আধুনিক নারীবাদের তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা ও ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য নিরূপণের মাধ্যমে বর্তমান সমাজে একটি বস্তুনিষ্ঠ ও গবেষণাভিত্তিক আলোচনা প্রতিষ্ঠা করাই এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারীবাদ : ধারণা, ইতিহাস ও প্রকারভেদ

নারীবাদ কী
নারীবাদের মৌলিক ধারণা
নারীবাদের উৎপত্তি ও ইতিহাস
নারীবাদের বিভিন্ন Wave
নারীবাদের প্রকারভেদ
বাংলাদেশে নারীবাদ

নারীবাদ (Feminism) কী:

নারীবাদ হলো একটি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মতাদর্শিক আন্দোলন, যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা ।

এটি নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে কথা বলে। এছাড়া নারীর স্বাধীনতা, ক্ষমতায়ন এবং মতামতের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্যও কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, কর্মক্ষেত্রে সমান বেতন, ভোটাধিকার, শিক্ষা লাভের সুযোগ এবং নিরাপদে বসবাসের অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়গুলো Feminism-এর গুরুত্বপূর্ণ দাবি হিসেবে বিবেচিত।

'নারীবাদ' (Feminism) শব্দের শাব্দিক উৎপত্তি ও বিশ্লেষণ:

ইংরেজি 'Feminism' শব্দটি হুট করে আসেনি, এর পেছনে একটি সুনির্দিষ্ট ভাষাগত ইতিহাস রয়েছে:

• 'Feminism' শব্দটির মূল উৎস হলো ল্যাটিন শব্দ 'Femina' (ফেমিনা), যার শাব্দিক অর্থ হলো 'নারী' (Woman) বা 'নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য'।

• ল্যাটিন শব্দ থেকে পরবর্তীতে ফরাসি ভাষায় 'Féminisme' (ফেদিনিজম) শব্দটির উৎপত্তি হয়। ১৮৩৭ সালে ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজ সংস্কারক চার্লস ফুরিয়ার

(Charles Fourier) প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন। তবে শুরুতে এটি কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না, বরং নারীর সামাজিক অবস্থাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীতে ১৮৯০-এর দশকের পর থেকে এটি বিশ্বজুড়ে নারীর অধিকার ও সমতা আদায়ের একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নারীবাদের সংজ্ঞা (Definitions of Feminism)

বিভিন্ন অভিধান ও দার্শনিকদের মতে নারীবাদের সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি অনুযায়ী নারীবাদ

"Advocacy of equality of the sexes and the establishment of the political, social, and economic rights of the female sex."

বাংলা অনুবাদ (অর্থ):

উভয় লিঙ্গের সমতার পক্ষে ওকালতি করা এবং নারী জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

বিশিষ্ট লেখক ও দার্শনিকদের মতে নারীবাদ

১. মেরি ওলস্টোনক্রাফট (Mary Wollstonecraft)

১৭৯২ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ A Vindication of the Rights of Woman-এ তিনি নারীর অধিকার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে—

"Feminism is the demand for the vindication of women's rights through equal educational and rational opportunities, enabling them to be companions to men rather than mere dependents."

বাংলা অনুবাদ (অর্থ):

নারীবাদ হলো সমান শিক্ষাগত ও যুক্তিবাদী সুযোগের মাধ্যমে নারীর অধিকারের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার দাবি, যা নারীকে কেবল পুরুষের ওপর নির্ভরশীল না করে তার যোগ্য সঙ্গী বা সহযাত্রী হিসেবে গড়ে তোলে।

২. সিমন দ্য বোভোয়ার (Simone de Beauvoir)

১৯৪৯ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Second Sex-এ তিনি নারীর সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন—

"One is not born, but rather becomes, a woman... Feminism's goal is to change society and how women are viewed within it, rejecting the social construct of woman as 'the Other'."

বাংলা অনুবাদ (অর্থ):

কেউ নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, বরং সমাজই তাকে নারী হিসেবে গড়ে তোলে। নারীবাদের লক্ষ্য হলো সমাজকে পরিবর্তন করা এবং নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো, যেখানে নারীকে পুরুষের তুলনায় 'অন্য' বা নিম্নতর হিসেবে দেখা হয়—এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করা।

নারীবাদের মৌলিক ধারণা:

নারীবাদের মৌলিক ধারণার মধ্যে অন্যতম হলো নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে সমতা প্রতিষ্ঠা করা। এই দৃষ্টিভঙ্গি পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সমালোচনা করে, যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং নারীরা বিভিন্নভাবে পিছিয়ে পড়ে। এ ধরনের বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে নারীবাদ সামাজিক পরিবর্তন ও অধিকারের দাবিকে গুরুত্ব দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একই কাজ করার পরেও নারীরা পুরুষের তুলনায় কম বেতন পায়, যা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের একটি স্পষ্ট উদাহরণ।

নারীবাদের উৎপত্তির প্রধান কারণসমূহ (Main Causes of Origin)

পাশ্চাত্যে নারীবাদ বা নারী অধিকার আন্দোলনের উৎপত্তির পেছনে সুনির্দিষ্ট কিছু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনি কারণ ছিল। নিচে কারণগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. শিল্প বিপ্লব এবং অর্থনৈতিক রূপান্তর (Industrial Revolution)

আঠারো ও উনিশ শতকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়। এর ফলে মানুষ কৃষিকাজ ছেড়ে শহরের কলকারখানায় কাজ করতে শুরু করে। বেঁচে থাকার তাগিদে এবং সস্তা শ্রমের প্রয়োজনে কারখানা মালিকেরা পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও কাজে নিয়োগ দেয়। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় মজুরি নিয়ে। নারীরা পুরুষদের সমান বা কখনো কখনো তাদের চেয়ে বেশি সময় হাড়ভাঙা খাটুনি খাটলেও, তাদের মজুরি দেওয়া হতো পুরুষের তুলনায় অর্ধেক বা তারও কম। এই চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণ নারীদের মনে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয়, যা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।

২. সম্পত্তির মালিকানা ও আইনি অধিকারের অভাব

উনিশ শতকের আগ পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার আইন অনুযায়ী বিবাহিত নারীদের নিজস্ব কোনো আইনি অস্তিত্ব ছিল না। একে বলা হতো 'কভারচার' (Coverture) আইন। এই আইন অনুযায়ী, বিয়ের পর একজন নারীর যাবতীয় সম্পত্তি ও উপার্জনের ওপর তার স্বামীর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতো। নারী নিজের নামে কোনো জমি কিনতে পারতো না, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারতো না, এমনকি নিজের উপার্জিত অর্থ নিজের ইচ্ছায় খরচও করতে পারতো না। এই আইনি পরাধীনতা ও অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নারীরা একত্রিত হতে শুরু করে।

৩. শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চনা

তৎকালীন পশ্চিমা সমাজে বিশ্বাস করা হতো যে, উচ্চশিক্ষা বা বিজ্ঞান-দর্শন চর্চা কেবল পুরুষদের কাজ। নারীদের কাজ শুধু রান্নাঘর সামলানো এবং সন্তান লালন-পালন করা। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নারীরা বুঝতে পারে যে, শিক্ষা ছাড়া তারা কখনো নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে না এবং সমাজের এই বৈষম্য দূর করতে পারবে না। ফলে শিক্ষার দাবিটি আন্দোলনের একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৪. রাজনৈতিক ও ভোটাধিকারের অভাব (Disenfranchisement)

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতে নারীদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার বা ভোটাধিকার ছিল না। রাষ্ট্র পরিচালনায় বা আইন প্রণয়নে

নারীদের কোনো মতামত নেওয়া হতো না। নারীরা উপলব্ধি করে যে, যতক্ষণ না তাদের হাতে ভোটাধিকার আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সরকার বা সংসদ তাদের অধিকার রক্ষায় কোনো আইন তৈরি করবে না। এই ভোটাধিকার অর্জনের জেদ থেকেই উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে (১৮৪৮ সালে আমেরিকার সেনেকা ফলস কনভেনশনের মাধ্যমে) নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ বা সুনির্দিষ্ট আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়।

৫. সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক নিপীড়ন

পশ্চিমা সমাজে নারীকে সবসময় পুরুষের চেয়ে বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতায় হীন বা নিচু জাতের ভাবা হতো। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ডিভোর্স বা তালাকের অধিকার এবং সন্তানের অভিভাবকত্ব—সবকিছুতেই কেবল পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। এই দমবন্ধ করা সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই নারীবাদী দর্শনের জন্ম দেয়।

নারীবাদের বিভিন্ন Wave

নারীবাদের ঐতিহাসিক বিবর্তন, এর লক্ষ্য ও আদর্শিক রূপান্তরকে সহজভাবে বোঝার জন্য সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষকগণ একে প্রধানত চারটি পর্যায় বা 'তরঙ্গ' (Waves)-এ ভাগ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রতিটি তরঙ্গে নারীদের অধিকারের দাবি ও আন্দোলনের ধরণ সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। নিচে এই চারটি তরঙ্গের বিস্তারিত ও তাত্ত্বিক আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

১. নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ: আইনি ও ভোটাধিকার আন্দোলন (First Wave of Feminism)

নারীবাদের ইতিহাসকে মূলত চারটি প্রধান পর্যায় বা 'তরঙ্গ' (Waves) হিসেবে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টিকে বলা হয় "নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ" (First Wave Feminism)। এই আন্দোলনের মূল সময়কাল ছিল উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ (মূলত ১৮৪৮ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত)। এই তরঙ্গের মূল ফোকাস বা লক্ষ্য ছিল নারীদের আইনি অধিকার এবং বিশেষ করে রাজনৈতিক ভোটাধিকার (Women's Suffrage) অর্জন করা।

প্রথম তরঙ্গের ঐতিহাসিক সূচনা

নারীবাদের প্রথম তরঙ্গের আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা ঘটেছিল ১৮৪৮ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কের "সেনেকা ফলস কনভেনশন" (Seneca Falls Convention)-এর মাধ্যমে। এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যান্টন (Elizabeth Cady Stanton) এবং লুক্রিশিয়া মট (Lucretia Mott)-এর মতো সাহসী নারীদের নেতৃত্বে এই ঐতিহাসিক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে প্রায় ৩০০ জন নারী-পুরুষ অংশ নেন এবং তারা একটি ঐতিহাসিক ইশতেহার বা ঘোষণা প্রকাশ করেন, যার নাম ছিল "Declaration of Sentiments" (অনুভূতির ঘোষণা)। এই ঘোষণাপত্রে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার আদলে দাবি করা হয় যে, "সকল পুরুষ এবং নারী সমানভাবে সৃষ্টি হয়েছেন" এবং নারীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব।

প্রথম তরঙ্গের প্রধান প্রধান দাবি ও উদ্দেশ্যসমূহ

এই প্রথম তরঙ্গের আন্দোলনের পেছনে সুনির্দিষ্ট কিছু দাবি ছিল। transatlantic তৎকালীন পশ্চিমা নারীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, কিছু মৌলিক আইনি ও রাজনৈতিক অধিকার না পেলে তারা সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবেন না।

দাবিগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

রাজনৈতিক ভোটাধিকার (The Right to Vote): প্রথম তরঙ্গের সবচেয়ে বড় এবং প্রধান দাবি ছিল ভোটাধিকার বা 'সাফ্রেজ' (Suffrage)। তৎকালীন ইউরোপ ও আমেরিকার সমাজব্যবস্থায় নারীদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। নারীবাদীরা যুক্তি দেন যে, দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী হওয়া সত্ত্বেও যদি আইন প্রণয়নে তাদের কোনো ভূমিকা না থাকে, তবে সেই গণতন্ত্র অপূর্ণ। তারা বিশ্বাস করতেন, ভোটাধিকার পেলে তারা সংসদে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারবেন এবং নারীদের সুরক্ষায় আইন তৈরি করতে পারবেন। এই আন্দোলনের নারীদের "Suffragettes" বা সাফ্রেজেট বলা হতো।

বিয়ে ও সম্পত্তির অধিকার (Property Rights): তৎকালীন পশ্চিমা আইন অনুযায়ী (যাকে কভারচার আইন বলা হতো), কোনো নারীর বিয়ে হওয়ার সাথে সাথে তার সমস্ত সম্পত্তি, বাপের বাড়ির জমি বা নিজের উপার্জনের মালিকানা তার স্বামীর অধীনে চলে যেত। প্রথম তরঙ্গের নারীবাদীরা এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাদের আন্দোলনের ফলেই ১৮৮২ সালে যুক্তরাজ্যে "Married Women's Property Act" (বিবাহিত নারীদের সম্পত্তি আইন) পাস হয়, যার মাধ্যমে বিবাহিত নারীরা নিজেদের সম্পত্তির ওপর স্বাধীন মালিকানার অধিকার লাভ করে।

শিক্ষার অধিকার (Right to Education): প্রথম তরঙ্গের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল নারীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া। তৎকালীন সময়ে বড় বড় নামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মেয়েদের ভর্তি নেওয়া হতো না। নারীবাদীরা দাবি করেন, নারীদের যদি ঘরের বাইরে এসে কাজ করতে হয় বা সচেতন নাগরিক হতে হয়, তবে তাদের শিক্ষার সুযোগ দিতেই হবে। এই আন্দোলনের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের জন্য উচ্চশিক্ষার দুয়ার উন্মোচিত হতে শুরু করে।

কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও মজুরি: শিল্প বিপ্লবের পর অনেক নারী কারখানায় কাজ শুরু করলেও তাদের কাজের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত নোংরা এবং পুরুষদের তুলনায় মজুরি ছিল অনেক কম। প্রথম তরঙ্গের নারীবাদীরা নারীদের কাজের সময় নির্দিষ্ট করা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার দাবি জানান।

প্রথম তরঙ্গের বড় বড় অর্জন ও সাফল্য

দীর্ঘ কয়েক দশকের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, জেল-জুলুম এবং আন্দোলনের পর প্রথম তরঙ্গের নারীবাদীরা ঐতিহাসিক কিছু সাফল্য অর্জন করেন:

আমেরিকায় ভোটাধিকার (১৯২০): দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৯২০ সালে মার্কিন সংবিধানের ১৯তম সংশোধনীর (19th Amendment) মাধ্যমে আমেরিকার নারীরা পূর্ণাঙ্গ ভোটাধিকার লাভ করেন।

যুক্তরাজ্যে ভোটাধিকার (১৯১৮ ও ১৯২৮): ১৯১৮ সালে ব্রিটেনে ৩০ বছর বা তার বেশি বয়সী নির্দিষ্ট কিছু শর্তে নারীরা ভোট দেওয়ার অধিকার পান। পরবর্তীতে ১৯২৮ সালে "Representation of the People Act"-এর মাধ্যমে পুরুষদের মতোই ২১ বছর বয়সী সকল নারী সমান ভোটাধিকার লাভ করেন।

২. নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গ: সামাজিক ও পারিবারিক মুক্তি আন্দোলন (Second Wave of Feminism)

নারীবাদের প্রথম তরঙ্গে নারীরা যখন vote দেওয়া এবং সম্পত্তির মালিকানার মতো আইনি অধিকারগুলো পেয়ে গেলেন, তখন তারা ভাবলেন তাদের মুক্তি চলে এসেছে। কিন্তু ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকের দিকে এসে পশ্চিমা নারীরা বুঝতে পারলেন যে, কাগজে-কলমে আইন পাস হলেও তাদের দৈনন্দিন জীবন, পরিবার এবং সমাজে পুরুষের আধিপত্য ও বৈষম্য একটুও কমেনি। এই প্রেক্ষাপট থেকেই ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে আমেরিকায় শুরু হয় "নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গ" (Second Wave Feminism), যা ১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। প্রথম তরঙ্গের ফোকাস যেখানে ছিল শুধু 'আইনি অধিকার', দ্বিতীয় তরঙ্গের ফোকাস ছিল নারীদের সামাজিক মর্যাদা, পারিবারিক বৈষম্য দূর করা এবং নিজের শরীরের ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

দ্বিতীয় তরঙ্গের ঐতিহাসিক সূচনা

নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের পেছনে দুটি বিখ্যাত বই ও একজন নারী প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছিলেন:

১. সিমন দ্য বোভোয়ার-এর 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' (১৯৪৯): ফরাসি লেখিকা সিমন দ্য বোভোয়ার তাঁর বইতে একটি বিখ্যাত কথা লিখেছিলেন—"নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, বরং সমাজ তাকে নারী বানিয়ে তোলে।" এর মানে হলো, জৈবিকভাবে নারী-পুরুষ আলাদা হলেও সমাজ মেয়েদেরকে জোর করে 'দুর্বল' ও 'অধীনস্থ' হিসেবে বড় করে তোলে।

২. বেটি ফ্রিডম্যান-এর 'দ্য ফেমিনিন মিস্টিক' (১৯৬৩): এই বইটিকে দ্বিতীয় তরঙ্গের আনুষ্ঠানিক সূচনা বলা হয়। বেটি ফ্রিডম্যান দেখান যে, আমেরিকার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত নারীরা ঘরের সব কাজ করেও এক ধরনের গভীর বিষণ্ণতা ও হতাশায় ভুগছেন। তারা কেবল একজন 'ভালো স্ত্রী' বা 'ভালো মা' পরিচয়ের বৃত্তে বন্দী থাকতে চান না, বরং তাদের নিজস্ব একটা ক্যারিয়ার ও পরিচয় প্রয়োজন।

দ্বিতীয় তরঙ্গের প্রধান প্রধান দাবি ও স্লোগান

দ্বিতীয় তরঙ্গের একটি বিখ্যাত স্লোগান ছিল—"The Personal is Political" (ব্যক্তিগত বিষয়গুলোই রাজনৈতিক)। অর্থাৎ, ঘরের ভেতরে নারীর ওপর যে নির্যাতন বা বৈষম্য হয়, তা কেবল পারিবারিক বিষয় নয়, এটি পুরো সমাজের একটি বড় political সমস্যা।

এই তরঙ্গের প্রধান দাবিগুলো নিচে দেওয়া হলো:

ঘরোয়া ও পারিবারিক বৈষম্যের অবসান: তৎকালীন পশ্চিমা সমাজে মেয়েদেরকে শুধু ঘরের কাজের জন্য বাধ্য করা হতো। দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদীরা দাবি করেন যে, সন্তান লালন-পালন ও রান্নাবান্নার কাজ শুধু নারীর একা নয়, এতে পুরুষেরও সমান দায়িত্ব নিতে হবে। তারা নারীকে কেবল 'মা' বা 'স্ত্রী'র পরিচয়ের বাইরে একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবি জানান।

কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য ও 'গ্লাস সিলিং' (Workplace Equality): যদিও প্রথম তরঙ্গের পর মেয়েরা চাকরি করার সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু উচ্চপদস্থ চাকরি বা ভালো বেতনের কাজগুলো কেবল পুরুষদের দেওয়া হতো। একই পদে কাজ করেও নারীরা কম বেতন পেতেন। দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদীরা "Equal Pay for Equal Work" (সমান কাজের জন্য সমান মজুরি) এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের পদোন্নতির দাবি তোলেন।

প্রজনন স্বাস্থ্য ও নিজের শরীরের ওপর অধিকার (Reproductive Rights): দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদীরা দাবি করেন, একজন নারী সন্তান জন্ম দেবেন কি না, বা কখন দেবেন—তা সম্পূর্ণ তার নিজের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে। এই দাবিতে তারা

গর্ভনিরোধক পিল (Birth Control Pill) সহজলভ্য করা এবং গর্ভপাতের (Abortion) আইনি বৈধতা আদায়ের জন্য তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। **১৯৭৩** সালে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট "রো বনাম ওয়েড" (Roe v. Wade) মামলার ঐতিহাসিক রায়ে গর্ভপাতকে আইনি স্বীকৃতি দেয়।

নারীদের ওপর সহিংসতা ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে আইন: তৎকালীন পশ্চিমা আইনে 'বৈবাহিক ধর্ষণ' (Marital Rape) বা স্বামীর মাধ্যমে স্ত্রীর ওপর শারীরিক নির্যাতনকে অপরাধ মনে করা হতো না। দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদীরা প্রথমবার গার্হস্থ্য সহিংসতা (Domestic Violence) এবং ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়নের দাবি তোলেন এবং নারীদের নিরাপত্তার জন্য 'রেপ ক্রাইসিস সেন্টার' ও আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তোলেন।

দ্বিতীয় তরঙ্গের বড় বড় অর্জন ও সাফল্য

আইনি সমতা: **১৯৭২** সালে আমেরিকায় "Title IX" আইন পাস হয়, যার মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের ওপর সব ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা: **১৯৭৪** সালে পাস হয় "Equal Credit Opportunity Act", যার মাধ্যমে পশ্চিমা নারীরা প্রথমবার স্বামীর সই বা পুরুষ অভিভাবক ছাড়াই ব্যাংক থেকে লোন নেওয়া বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের স্বাধীনতা পান।

সামাজিক সচেতনতা: সমাজে নারীদের প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে এই তরঙ্গ এক বিশাল ভূমিকা রাখে।

৩. নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গ: বৈচিত্র্য এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Third Wave of Feminism)

নারীবাদের প্রথম ও দ্বিতীয় তরঙ্গের পর **১৯৯০**-এর দশকের শুরুতে আমেরিকায় এবং পশ্চিমা বিশ্বে "নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গ" (Third Wave Feminism) শুরু হয়, যা একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। দ্বিতীয় তরঙ্গের আন্দোলনের ফলে নারীরা কর্মক্ষেত্রে এবং সমাজে অনেকখানি এগিয়ে গেলেও, নতুন প্রজন্মের তরুণী ও গবেষিকারা লক্ষ্য করলেন যে, আগের আন্দোলনগুলোতে কেবল শ্বেতাঙ্গ, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চশিক্ষিত নারীদের অধিকারের কথাই বেশি বলা হয়েছে। এশিয়ান, আফ্রিকান, কৃণাঙ্গ,

নিম্নবিত্ত কিংবা বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতির সাধারণ নারীদের সুখ-দুঃখ ও অধিকার সেখানে অবহেলিত রয়ে গেছে। এই ঘাটতি দূর করতেই মূলত তৃতীয় তরঙ্গের সূচনা হয়।

তৃতীয় তরঙ্গের ঐতিহাসিক সূচনা

১৯৯২ সালে রেবেকা ওয়াকার (Rebecca Walker) নামক একজন আফ্রো-আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ নারী অধিকার কর্মী 'মিস' (Ms.) ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ লিখেন, যার শিরোনাম ছিল—"Becoming the Third Wave" (তৃতীয় তরঙ্গে রূপান্তর)। এই প্রবন্ধের মাধ্যমেই মূলত তৃতীয় তরঙ্গের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এই তরঙ্গের মূল ভিত্তি ছিল "ইন্টারসেকশনালিটি" (Intersectionality) বা বহুমুখী বৈষম্য তত্ত্ব । এর সহজ অর্থ হলো—একজন নারীর সমস্যা শুধু সে 'নারী' হওয়ার কারণে হয় না; barat তার গায়ের রং (Race), অর্থনৈতিক অবস্থা (Class) এবং ভৌগোলিক অবস্থানও তার অধিকারের ওপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন শ্বেতাঙ্গ ধনী নারীর জীবন আর একজন কৃষ্ণাঙ্গ বা এশিয়ান দরিদ্র কর্মজীবী নারীর জীবন ও সমস্যা এক নয়।

তৃতীয় তরঙ্গের প্রধান প্রধান দাবি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

তৃতীয় তরঙ্গের আন্দোলন আগের দুটি তরঙ্গের চেয়ে অনেকটাই আলাদা, আধুনিক এবং কিছুটা উন্মুক্ত বা উদার ছিল। এর প্রধান দাবি ও লক্ষ্যগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তি (Diversity and Inclusivity): তৃতীয় তরঙ্গের সবচেয়ে বড় দাবি ছিল, নারীবাদের মঞ্চে সব ধরনের নারীর জায়গা দিতে হবে। কৃষ্ণাঙ্গ, এশিয়ান, ল্যাটিনো এবং মুসলিম নারীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও অধিকারকেও সম্মান করতে হবে। শ্বেতাঙ্গ নারীদের তৈরি করে দেওয়া কোনো নির্দিষ্ট ফ্রেম বা ছকে সব নারীর স্বাধীনতা মাপা যাবে না।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও পোশাকের অধিকার: দ্বিতীয় তরঙ্গের অনেক নারীবাদী মনে করতেন মেকআপ করা, হাই হিল জুতো পরা বা বেশি জমকালো পোশাক পরা হলো পুরুষকে খুশি করার মাধ্যম। কিন্তু তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদীরা এই ধারণার তীব্র বিরোধিতা

করেন। তারা বলেন, একজন নারী মেকআপ করবে কি না, শর্ট ড্রেস পরবে নাকি হিজাব বা শালীন পোশাক পরবে—তা সম্পূর্ণ তার নিজের স্বাধীনতা। তারা রূপচর্চা বা নারীবাদকে একে অপরের বিরোধী মনে না করে নারীর নিজস্ব পছন্দ বা চয়েস হিসেবে তুলে ধরেন।

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ (Anti-Harassment Movement): এই তরঙ্গের নারীরা কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং রাস্তায় নারীদের ওপর হওয়া সব ধরনের যৌন হয়রানি, কটূক্তি বা 'ইভটিজিং'-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তারা নারীর জন্য একটি নিরাপদ ও হয়রানিমুক্ত পরিবেশ গড়ার ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেন।

পপ কালচার ও প্রযুক্তির ব্যবহার: তৃতীয় তরঙ্গের সময় বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেট এবং মিডিয়ার ব্যাপক বিস্তার ঘটে। এই তরঙ্গের আন্দোলনকারীরা গান, ব্লগ, ম্যাগাজিন এবং অনলাইনের মাধ্যমে তাদের দাবি ও চিন্তাভাবনা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেন। এই সময়ে বিশ্বজুড়ে নারীবাদী আন্দোলনের প্রচার-প্রসার খুব দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়।

নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গ (Fourth Wave of Feminism)

একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অর্থাৎ ২০১২ সালের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে নারী অধিকার আন্দোলনের যে নতুন রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাকে "নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গ" (Fourth Wave Feminism) বলা হয়।

তৃতীয় তরঙ্গের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সাথে নিয়ে এই চতুর্থ তরঙ্গটি মূলত গড়ে উঠেছে আধুনিক প্রযুক্তি, ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়া (যেমন: ফেসবুক, এক্স বা টুইটার, ইনস্টাগ্রাম)-কে কেন্দ্র করে। এই তরঙ্গের মূল ফোকাস বা লক্ষ্য হলো—নারীদের ওপর সব ধরনের যৌন সহিংসতা, অনলাইন হ্যারাসমেন্ট, কর্মক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

চতুর্থ তরঙ্গের ঐতিহাসিক সূচনা ও প্রযুক্তির

চতুর্থ তরঙ্গের কোনো নির্দিষ্ট একটি সূচনা কেন্দ্র নেই, বরং ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার হ্যাশট্যাগ (#) আন্দোলনের মাধ্যমে এর জন্ম। ২০১২ সালে লন্ডনে লরা বেটস

(Laura Bates) নামের এক অধিকারকর্মী "Everyday Sexism Project" নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করেন, যেখানে নারীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া ইভটিজিং বা যৌন হয়রানির অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারতেন। তবে এই চতুর্থ তরঙ্গটি বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বড় ঝড় তোলে ২০১৭ সালে মার্কিন চলচ্চিত্র প্রযোজক হার্ভে ওয়াইনস্টিনের বিরুদ্ধে হলিউড অভিনেত্রীদের যৌন শোষণের ঘটনা ফাঁসের পর। তখন বিশ্বজুড়ে #MeToo (মি টু) আন্দোলন শুরু হয়, যা চতুর্থ তরঙ্গের সবচেয়ে বড় প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়।

চতুর্থ তরঙ্গের প্রধান প্রধান দাবি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

চতুর্থ তরঙ্গের আন্দোলনগুলো আগের তিন তরঙ্গের চেয়ে অনেক বেশি তীব্র, বৈশ্বিক এবং প্রযুক্তি-নির্ভর। এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ও দাবিগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. যৌন হয়রানি ও ধর্ষণের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই (Combatting Rape Culture)চতুর্থ তরঙ্গের প্রধানতম লক্ষ্য হলো সমাজ থেকে "রেপ কালচার" বা ধর্ষণের সংস্কৃতি দূর করা। কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রভাবশালী পুরুষেরা যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোনো নারীকে ব্ল্যাকমেইল বা যৌন হয়রানি করতে না পারে, সেজন্য কঠোর আইন ও সামাজিক সচেতনতা তৈরির দাবি তোলা হয়। #MeToo আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে অনেক প্রভাবশালী অপরাধীকে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

২. ডিজিটাল অ্যাক্টিভিজম ও হ্যাশট্যাগ আন্দোলন (Digital Activism)এই তরঙ্গের মূল শক্তি হলো সোশ্যাল মিডিয়া। নারীরা এখন রাস্তায় নেমে আন্দোলনের পাশাপাশি অনলাইনের মাধ্যমে ঘরে বসেই বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ নারীর কাছে পৌঁছাতে পারেন। যেমন— #TimesUp, #NiUnaMenos বা বাংলাদেশে #MeEven বা বিভিন্ন অধিকার মূলক হ্যাশট্যাগ ক্যাম্পেইন। এর মাধ্যমে নারীরা তাদের ওপর হওয়া যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বজুড়ে জনমত গড়ে তুলতে পারেন।

৩. অনলাইন হ্যারাসমেন্ট বা সাইবার বুলিং প্রতিরোধ প্রযুক্তির প্রসারের সাথে সাথে নারীরা এখন ডিজিটাল স্পেসেও হ্যারাসমেন্টের শিকার হচ্ছেন। ইন্টারনেটে মেয়েদের ছবি বিকৃত করা, ইনবক্সে নোংরা মেসেজ পাঠানো বা সাইবার বুলিং করার বিরুদ্ধে চতুর্থ তরঙ্গের নারীবাদীরা সোচ্চার হয়েছেন এবং সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

৪. বডি পজিটিভিটি এবং মিডিয়ার বৈষম্য দূরীকরণ (Body Positivity) মিডিয়া বা বিজ্ঞাপনগুলোতে নারীকে কেবল 'আকর্ষণীয় বস্তু' বা নির্দিষ্ট শারীরিক সৌন্দর্যের ছকে (যেমন: ফর্সা ও স্লিম হতে হবে) যেভাবে উপস্থাপন করা হয়, চতুর্থ তরঙ্গ তার তীব্র বিরোধিতা করে। তারা দাবি করেন, প্রতিটি নারীর শরীরের গঠন, গায়ের রং এবং রূপ যেমনই হোক না কেন—তা সমানভাবে সম্মানিত ও সুন্দর।

নারীবাদের বিভিন্ন ধারা

“নারীবাদ বিভিন্ন মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে নানা প্রকারে বিভক্ত। তবে প্রধানত নারীবাদকে চারটি মূল ধারায় ভাগ করা হয়— উদারপন্থী নারীবাদ, র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ, মার্কসবাদী/সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ এবং সাংস্কৃতিক নারীবাদ। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এর আরও বহু উপধারা ও মতবাদ বিকশিত হয়েছে।”

১. র‍্যাডিকাল বা উগ্রপন্থী নারীবাদ (Radical Feminism)

নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের (১৯৬০-১৯৮০ দশক) সময় যে কয়েকটি প্রভাবশালী মতবাদ বা ধারার জন্ম হয়েছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত, সমালোচিত ও চরমপন্থী ধারাটি হলো ‘র‍্যাডিকাল নারীবাদ’ (Radical Feminism)। ইংরেজি 'Radical' শব্দের অর্থ হলো 'আমূল' বা 'শিকড়'। এই ধারার নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, সমাজ থেকে নারীর ওপর বৈষম্য দূর করতে হলে কেবল কিছু আইন পাস বা অর্থনৈতিক সংস্কার করলেই হবে না; বরং সমাজের একদম গোড়ায় বা শিকড়ে যে 'পুরুষতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা' (Patriarchy) গেঁথে আছে, তাকে পুরোপুরি উপড়ে ফেলতে হবে।

র‍্যাডিকাল নারীবাদের মূল তাত্ত্বিক চিন্তাধারা:

এই ধারার মূল প্রবক্তা ছিলেন শুল্যামিথ ফায়ারস্টোন (Shulamith Firestone) এবং মেরি ডেলির মতো পশ্চিমা লেখিকারা। তাদের প্রধান প্রধান চিন্তাভাবনা ও তত্ত্বগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. পুরুষতন্ত্রই হলো শোষণের মূল হাতিয়ার:র‍্যাডিকাল নারীবাদীদের মতে, মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন এবং প্রথম শোষণের রূপ হলো পুরুষের দ্বারা নারীর ওপর শোষণ। তারা সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করেন— শোষক (পুরুষ) এবং শোষিত (নারী)। তারা মনে করেন, পরিবার, সমাজ, ধর্ম এবং রাষ্ট্র— সবকিছুই তৈরি করা হয়েছে পুরুষদের সুবিধা দেওয়ার জন্য এবং নারীদের দাস বানিয়ে রাখার জন্য। তাই পুরো ব্যবস্থাটিকে ভেঙে নতুন করে সাজাতে হবে।

২. পরিবার ও মাতৃত্বের বিরোধিতা: এই ধারার সবচেয়ে বিতর্কিত তত্ত্ব হলো পরিবার ব্যবস্থার বিরোধিতা। র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা মনে করেন, 'ঐতিহ্যবাহী পরিবার ব্যবস্থা' (Traditional Family) হলো নারীকে বন্দী রাখার প্রথম কারাগার। তাদের মতে, সন্তান জন্ম দেওয়া (মাতৃত্ব) এবং ঘরকন্নার কাজ করার মাধ্যমেই নারী পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং নিজের স্বাধীনতা হারায়। শুল্যামিথ ফায়ারস্টোন তাঁর বইতে এমনও প্রস্তাব করেছিলেন যে, নারীদের সন্তান জন্মদানের কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে কৃত্রিম উপায়ে বা ল্যাবরেটরিতে সন্তান উৎপাদনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিত।

৩. লৈঙ্গিক ভূমিকা ও সংস্কৃতির বর্জন (Gender Abolition): তারা সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত 'নারীসুলভ' (Feminine) আচরণ— যেমন শান্ত থাকা, রূপচর্চা করা বা ঘরের কাজ করাকে পুরুষের চাপিয়ে দেওয়া দাসত্ব মনে করেন। তারা চান সমাজ থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যকার এই লৈঙ্গিক পার্থক্যের ধারণাটাই পুরোপুরি মুছে ফেলা হোক।

৪. পুরুষ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব (Separatism): র‍্যাডিকাল নারীবাদের একটি চরমপন্থী অংশ মনে করে, নারীদের প্রকৃত মুক্তি তখনই সম্ভব যখন তারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এবং পুরুষদের থেকে পুরোপুরি আলাদা বা বিচ্ছিন্ন হয়ে (Separatism) নিজেদের আলাদা নারী সমাজ গড়ে তুলবে।

২. লিবারেল বা উদারপন্থী নারীবাদ (Liberal Feminism)

র‍্যাডিকাল নারীবাদের মতো চরমপন্থী চিন্তার বাইরে, নারীবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও মূলধারার যে মতবাদটি রয়েছে, তাকে 'লিবারেল নারীবাদ' (Liberal Feminism) বলা হয়। এই ধারার মূল ভিত্তি হলো পশ্চিমা উদারপন্থী রাজনৈতিক দর্শন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। লিবারেল নারীবাদীরা সমাজ বা পরিবার ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে চান না; বরং তারা মনে করেন, বিদ্যমান সমাজ ও আইনি কাঠামোর ভেতরে থেকেই শিক্ষার বিস্তার, আইনি সংস্কার এবং সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

লিবারেল নারীবাদের মূল চিন্তাধারা ও দাবি: এই ধারার প্রবক্তা হিসেবে মেরি ওলস্টোনক্রাফট, জন স্টুয়ার্ট মিল এবং বেটি ফ্রিডম্যানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের প্রধান দাবিগুলো নিম্নরূপ:

১. সুযোগের সমতা (Equality of Opportunity): তাদের মূল কথা হলো, একজন নারী মানুষ হিসেবে পুরুষের মতোই সমান বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতার অধিকারী। তাই কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা এবং রাজনীতিতে পুরুষরা যে সুযোগ পায়, নারীদেরও ঠিক সেই একই সুযোগ দিতে হবে।

২. আইনি ও রাজনৈতিক সংস্কার: লিবারেল নারীবাদীরা আইন পরিবর্তনের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেন। তারা মনে করেন, নারীদের বৈষম্যের মূল কারণ হলো বৈষম্যমূলক আইন ও সমাজের কুসংস্কার। আইন করে নারীর ভোটাধিকার, সমান মজুরি এবং সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করলেই বৈষম্য দূর হবে।

৩. ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নিজের ক্যারিয়ার গঠন: তারা বিশ্বাস করেন, প্রতিটি নারীর অধিকার আছে নিজের জীবন ও ক্যারিয়ার নিয়ে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার। সে ঘরের কাজ করবে নাকি বাইরে চাকরি করবে—তা সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয় হওয়া উচিত।

৩. মার্ক্সিস্ট ও সোশ্যালিস্ট নারীবাদ (Marxist and Socialist Feminism)

নারীবাদের আরেকটি বিশেষ প্রভাবশালী অর্থনৈতিক ধারা হলো 'মার্ক্সিস্ট বা সোশ্যালিস্ট নারীবাদ' (Marxist/Socialist Feminism)। কার্ল মার্ক্স এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদ-বিরোধী অর্থনৈতিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে এই মতবাদটি গড়ে উঠেছে। এই ধারার নারীবাদীরা মনে করেন, নারীর ওপর শোষণের মূল কারণ পুরুষতন্ত্র নয়, বরং 'পুঁজিবাদ' (Capitalism) এবং অর্থনৈতিক অসমতা।

মার্ক্সিস্ট ও সোশ্যালিস্ট নারীবাদের মূল চিন্তাধারা:

১. পুঁজিবাদ ও নারীর সস্তা শ্রম:এই ধারার মতে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা মুনাফা বাড়ানোর জন্য পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও কারখানায় সস্তা শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করে। অথচ পুরুষদের চেয়ে নারীদের অনেক কম মজুরি দেওয়া হয়। পুঁজিবাদ ধ্বংস না হলে নারীর এই অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়।

২. গৃহস্থালি কাজের অবমূল্যায়ন (Unpaid Domestic Labor):তারা যুক্তি দেন যে, নারীরা ঘরের ভেতরে যে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটেন—যেমন রান্না করা, ঘর পরিষ্কার করা, সন্তান লালন-পালন করা—তার কোনো অর্থনৈতিক মূল্যায়ন বা মজুরি সমাজ দেয় না। পুঁজিবাদী সমাজ নারীর এই অবৈতনিক শ্রমের ওপর ভিত্তি করেই টিকে আছে। তাই ঘরের কাজেরও রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক স্বীকৃতি দিতে হবে।

৩. সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধিতা:এঙ্গেলসের মতে, সমাজে যখন থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা চালু হয়েছে, তখন থেকেই পুরুষরা তাদের সম্পত্তি নিজেদের রক্তের সন্তানের কাছে রেখে যাওয়ার জন্য নারীদের ঘরের চার দেয়ালে বন্দী করে বিশ্বস্ত দাসী বা বংশ রক্ষার হাতিয়ারে পরিণত করেছে।

৪.কালচারাল বা সাংস্কৃতিক নারীবাদ (Cultural Feminism)

র‍্যাডিকাল ও লিবারেল নারীবাদের পাশাপাশি ১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে পশ্চিমা বিশ্বে 'কালচারাল বা সাংস্কৃতিক নারীবাদ' (Cultural Feminism) নামের একটি ভিন্নধর্মী ধারার জন্ম হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় তরঙ্গের অনেক নারীবাদী যেখানে নারী ও পুরুষের ভেদাভেদ সম্পূর্ণ মুছে ফেলে পুরুষদের মতো হতে চেয়েছিলেন, কালচারাল নারীবাদীরা সেই ধারণার বিরোধিতা করেন। তারা বলেন, নারী ও পুরুষের মধ্যে জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে এবং নারীদের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলোকে পুরুষের চেয়ে খাটো করে না দেখে সমাজের বুকে আলাদাভাবে সম্মানিত করতে হবে।

কালচারাল নারীবাদের মূল তাত্ত্বিক চিন্তাধারা:

১. নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠত্ব:তারা মনে করেন, নারীদের সহজাত কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে— যেমন দয়া, সহমর্মিতা, সন্তান লালন-পালনের ক্ষমতা, শান্তিপ্রিয়তা এবং অহিংস মনোভাব। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এই গুণগুলোকে 'দুর্বলতা' মনে করে অবহেলা করেছে। কিন্তু কালচারাল নারীবাদীদের মতে, এই গুণগুলো দুর্বলতা নয়, বরং এগুলোই মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় শক্তি।

২. সমাজ বিনির্মাণে নারীত্বের গুরুত্ব: তারা দাবি করেন, সমাজ ও রাষ্ট্রকে কেবল পুরুষের তৈরি করা কঠোর বা যুদ্ধংদেহী নিয়মে চালালে হবে না। রাষ্ট্র পরিচালনায় ও সমাজ বিনির্মাণে নারীদের এই মমতাময়ী ও শান্তিপ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গিকে যুক্ত করতে হবে, তবেই পৃথিবীতে যুদ্ধ ও সহিংসতা কমবে।

৩. নারী সংস্কৃতির উদযাপন (Counter-Culture):তারা নারীদের জন্য আলাদা সাহিত্য, শিল্প, গান এবং সাংস্কৃতিক বলয় তৈরির ওপর জোর দেন, যেখানে নারীরা পুরুষের অনুকরণ না করে নিজেদের স্বাধীন ও অনন্য বৈশিষ্ট্য উদযাপন করতে পারবেন।

৫. ইকো-ফেমিনিজম বা পরিবেশবাদী নারীবাদ (Ecofeminism)

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে (১৯৭৪ সালে ফরাসি লেখিকা ফ্রাঁসোয়া ডি'উবোন-এর হাত ধরে) নারীবাদের যে পরিবেশবাদী ধারাটি আত্মপ্রকাশ করে, তাকে 'ইকো-ফেমিনিজম' (Ecofeminism) বলা হয়। এই মতবাদের মূল কথা হলো— সমাজে পুরুষ যেভাবে ক্ষমতার জোরে নারীকে শোষিত ও অধীনস্থ করে রেখেছে, ঠিক একইভাবে মানুষ তার লোভ ও ক্ষমতার জোরে প্রকৃতির (Nature) ওপর অত্যাচার ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। অর্থাৎ, নারীর ওপর শোষণ এবং প্রকৃতির ওপর শোষণ— এই দুটি বিষয়ের মূল উৎস একই।

ইকো-ফেমিনিজমের মূল তাত্ত্বিক চিন্তাধারা:

১. নারী ও প্রকৃতির আত্মিক বন্ধন:ইকো-ফেমিনিস্টরা মনে করেন, প্রকৃতির মতো নারীর মধ্যেও নতুন প্রাণ সৃষ্টির ও লালন-পালনের এক স্বর্গীয় ক্ষমতা রয়েছে (যেমন পৃথিবীকে আমরা 'ধরিত্রী মাতা' বা Mother Nature বলি)। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও পুঁজিবাদ যেভাবে বনের পর বন কেটে, নদী দূষণ করে প্রকৃতিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে, ঠিক একইভাবে তারা নারীদেরও ঘরের চার দেয়ালে বন্দী করে বা মিডিয়াতে পণ্যায়ন করে শোষণ করছে।

২. পরিবেশ ধ্বংস ও নারীর বিপর্যয়:তারা যুক্তি দেন, যখন পরিবেশ বা জলবায়ুর ক্ষতি হয় (যেমন খরা, বন্যা বা সুপেয় পানির অভাব), তখন তার প্রথম ও সবচেয়ে বড় শিকার হয় গ্রামীণ ও দরিদ্র নারীরা। কারণ পানি ও জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ বা কৃষিকাজের সাথে নারীরা সরাসরি জড়িত। তাই পরিবেশ রক্ষা ছাড়া নারীর প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়।

৩. পরিবেশ রক্ষায় নারীর নেতৃত্ব: তারা টেকসই উন্নয়ন এবং পৃথিবী সুরক্ষার জন্য পরিবেশ আন্দোলনের সম্মুখভাগে নারীদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দাবি জানান (যেমন ভারতের ঐতিহাসিক 'চিপকো আন্দোলন', যেখানে নারীরা গাছ বাঁচাতে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন)।

৬.কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদ (Black Feminism)

নারীবাদের মূলধারার ইতিহাসগুলোতে দীর্ঘ সময় ধরে কেবল পশ্চিমা শ্বেতাঙ্গ ও মধ্যবিত্ত নারীদের সমস্যাগুলোকে ফোকাস করা হয়েছিল। এই একপেশে চিন্তার প্রতিক্রিয়ায় বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে (বিশেষ করে ১৯৬০ ও ৭০-এর দশকে) আমেরিকায় "কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদ" (Black Feminism) নামক একটি শক্তিশালী ধারার জন্ম হয়। এই ধারার মূল কথা হলো— একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী সমাজে কেবল 'নারী' হওয়ার কারণে বৈষম্যের শিকার হয় না, বরং সে একই সাথে তার গায়ের রং বা বর্ণ (Race) এবং অর্থনৈতিক শ্রেণী (Class)-র কারণেও মারাত্মক শোষণের মুখোমুখি হয়।মূল তাত্ত্বিক চিন্তাধারা ও দাবিএই ধারার প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে বেল হুকস (bell hooks), অড্রে লর্ড (Audre Lorde) এবং প্যাট্রিসিয়া হিল কলিন্স (Patricia Hill Collins)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
তাদের প্রধান দাবিগুলো নিম্নরূপ:

১. বর্ণবাদ ও লিঙ্গবাদের যৌথ শোষণ (Intersectional Oppression):কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদীরা যুক্তি দেন যে, শ্বেতাঙ্গ নারীবাদীরা শুধু 'লিঙ্গবৈষম্য' (Sexism) নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারীকে একই সাথে লিঙ্গবাদ এবং বর্ণবাদ (Racism)— এই দুই ধরণের সামাজিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তাই বর্ণবাদ দূর না করে কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের মুক্তি সম্ভব নয়।

২. শ্বেতাঙ্গ নারীবাদের সমালোচনা:তারা মূলধারার শ্বেতাঙ্গ নারীবাদীদের সমালোচনা করে বলেন, শ্বেতাঙ্গ নারীদের ঘরে যে দাসী বা গৃহকর্মী হিসেবে সস্তায় খাটানো হতো, তারা ছিলেন মূলত কৃষ্ণাঙ্গ বা নিম্নবর্ণের নারী। ফলে শ্বেতাঙ্গ নারীদের মুক্তির আন্দোলন অনেক সময় কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের শোষণের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছিল।

৩. কম্বাহি নদী কালেক্টিভ (Combahee River Collective - 1977):এটি ছিল কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদীদের একটি বিখ্যাত সংগঠন। তারা ১৯৭৭ সালে একটি ঐতিহাসিক ইশতেহার প্রকাশ করে বলেন যে, কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের মুক্তি মানে হলো এমন একটি সমাজ গঠন করা যেখানে বর্ণ, লিঙ্গ এবং অর্থনৈতিক শ্রেণীর কোনো বৈষম্য থাকবে না।

৭. ইসলামী নারীবাদ (Islamic Feminism)ধারণা ও উদ্ভব:

ইসলামী নারীবাদ হলো এমন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক আন্দোলন, যা ইসলামের মূল উৎস (আল-কুরআন ও সুন্নাহ)-এর লিঙ্গ-সমতাভিত্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, বিশেষ করে ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে মধ্যপ্রাচ্য এবং বৈশ্বিক মুসলিম সমাজে মূলধারার পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ নারীবাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই ধারার উদ্ভব হয়। এর মূল কথা হলো, ইসলাম নারীকে বৈষম্য করেনি, বরং পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ধর্মীয় অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে নারীদের অধিকার খর্ব করেছে।প্রধান প্রবক্তা: এই ধারার প্রধান চিন্তাবিদ ও প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে আমিনা ওয়াদুদ (Amina Wadud), ফাতেমা মেরনিসি (Fatema Mernissi) এবং আসমা বারলাস (Asma Barlas) অন্যতম।

মূল উদ্দেশ্য ও দাবিসমূহ:ধর্মীয় গ্রন্থের পুনঃব্যাখ্যা: পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে কুরআন ও হাদিসের সাম্যবাদী ও সমতাভিত্তিক আধুনিক ব্যাখ্যা (ইজতিহাদ) প্রদান করা।পারিবারিক আইনের সংস্কার: মুসলিম পারিবারিক আইন সংস্কারের মাধ্যমে বহুবিবাহ হ্রাস, বাল্যবিবাহ রোধ এবং বিবাহবিচ্ছেদ ও সন্তানের অভিভাবকত্বে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।অর্থনৈতিক স্বাধীনতা: শরিয়াহ সম্মত উপায়ে পৈতৃক ও বৈবাহিক সম্পত্তিতে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা এবং কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া।নেতৃত্বে অংশগ্রহণ: ধর্মীয় বিচার ব্যবস্থা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং ধর্মীয় পণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে নারীদের সমান সুযোগ ও প্রবেশাধিকার দেওয়া।

৬. বাংলাদেশে নারীবাদ: প্রেক্ষাপট ও বিবর্তন (Feminism in Bangladesh)

বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে নারী অধিকার এবং নারী জাগরণের একটি সুদীর্ঘ ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। এদেশের প্রেক্ষাপটে নারীবাদ বা নারী জাগরণ আন্দোলনটি পশ্চিমা অন্ধ অনুকরণের চেয়ে বাঙালি মুসলিম ও হিন্দু সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণ, নারীদের শিক্ষা এবং আইনি সুরক্ষার তাগিদ থেকেই মূলত গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের প্রধান ধারাসমূহ (Key Strands)বাংলাদেশের নারী অধিকার আন্দোলনকে প্রধানত তিনটি ধারায় ভাগ করে বিশ্লেষণ করা যায়:

১.ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজ সংস্কারমূলক ধারা: এই ধারাটি বেগম রোকেয়া থেকে শুরু করে সুফিয়া কামাল এবং সমকালীন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আন্দোলনের সাথে যুক্ত। এদের মূল লক্ষ্য হলো— রাষ্ট্র ও সমাজে নারীর জন্য সমান আইনি অধিকার, কুসংস্কারের অবসান, এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কঠোর আইনের বাস্তবায়ন।
২.উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ধারা: স্বাধীনতার পর এনজিও (NGO) এবং তৈরি পোশাক শিল্পের (RMG) মাধ্যমে এই ধারাটি বিকশিত হয়। গ্রামীণ ব্যাংক বা ব্র্যাক-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে শুরু করে। লাখ লাখ নারীর কর্মসংস্থান গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

ইসলামি বা মুসলিম নারীবাদী ধারা (Islamic Feminism): এটি বাংলাদেশের একটি সমকালীন ও ক্রমবর্ধমান ধারা। এই ধারার গবেষক ও নারীরা পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ নারীবাদের এজেন্ডা প্রত্যাখ্যান করেন। তারা মনে করেন, পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণ না করে ইসলামের খাঁটি শরিয়তি বিধান (যেমন: উত্তরাধিকারের সঠিক বণ্টন, মোহরানা আদায় এবং সম্মানজনক সামাজিক মর্যাদা) নিশ্চিত করার মাধ্যমেই এদেশের মুসলিম নারীদের প্রকৃত মুক্তি সম্ভব।

ঐতিহাসিক বিবর্তন (Historical Evolution)

১. প্রাক-স্বাধীনতা যুগ ও বেগম রোকেয়া (Begum Rokeya's Era):বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী জাগরণের অগ্রদূত হলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। তিনি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তাঁর লেখনী (যেমন: সুলতানার স্বপ্ন, পদ্মরাগ) এবং স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীদের অবরুদ্ধ অবস্থা বা চরম পর্দা প্রথার কুসংস্কার থেকে বের করে শিক্ষার আলো দেখানোর লড়াই শুরু করেন। তাঁর সমসাময়িক সময়ে সুফিয়া কামাল, শামসুন্নাহার মাহমুদ এবং শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বোন ফাতেমা খাতুনের মতো নারীরা সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র ভূমিকা রাখেন।

২. স্বাধীনতা যুদ্ধ ও নারীদের অবদান (১৯৭১)১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। তারা শুধু সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধই করেননি, বরং যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবা, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দান এবং গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। স্বাধীনতার পর বীরাঙ্গনা নারীদের পুনর্বাসন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে নারীদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি রাষ্ট্রীয়ভাবে সামনে আসে।

৩. উত্তর-স্বাধীনতা ও এনজিও (NGO) আন্দোলন (১৯৮০-১৯vano দশক)স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে নারীবাদী আন্দোলন মূলত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে বিভিন্ন নারী সংগঠন (যেমন: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ) এবং এনজিওগুলোর মাধ্যমে।ক্ষুদ্রঋণ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন: গ্রামীণ ব্যাংক বা ব্র্যাক-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে শুরু করে, যা গ্রামীণ পরিবারে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।পোশাক শিল্প (RMG Sector): নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে লাখ লাখ নারীর অংশগ্রহণ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান আমূল বদলে দেয়।

৪. আইনি সংস্কার ও বর্তমান ডিজিটাল যুগবাংলাদেশে নারী অধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্রীয়ভাবে বেশ কিছু যুগান্তকারী আইন পাস হয়েছে, যা এদেশের নারী আন্দোলনের বড় সাফল্য:

- যৌতুক নিরোধ আইন (১৯৮০/২০১৮)
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (২০০০)
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন (২০১০)

বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের তরুণী ও অধিকারকর্মীরা সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি, ইভটিজিং এবং সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ ও সচেতনতা গড়ে তুলছেন, যা বিশ্বব্যাপী চতুর্থ তরঙ্গের আন্দোলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন ধর্মে নারীদের অবস্থান

১. প্রাচীন ভারতে তথা হিন্দু ধর্মে নারী

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাবের আগে নারী জাতির অবস্থা ছিল অত্যন্ত সূচনীয়। নারীদেরকে পাপ, নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতার ধ্বংসের মূল উৎস বলে বিবেচনা করা হত। তাদেরকে সর্বদা শাসনাধীনে রাখাই ছিল আসল নীতি। প্রাচীন ভারতে তথা হিন্দু ধর্মে ও নারীরা নানা দিক থেকে নানা ভাবে চরম বৈষম্যের শিকার হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মনু স্মৃতির অধ্যয়নে জানা যায় যে, মনু যখন নারী সৃষ্টি করেছিল তখন সে নারীকে পুরুষের প্রতি প্রেম, রূপচর্চা, যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা এবং ক্রোধের প্রবণতা দানকারিণী রূপে সৃষ্টি করে এবং মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে নারীকে নিকৃষ্টতম ব্যবহারের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করে। সুতরাং হিন্দু সমাজে এই ধারণা খ্যাতি অর্জন করে যে, নারী হচ্ছে নোংরামির জড় এবং তার অস্তিত্ব হচ্ছে আগাগোড়া নরক। (বিশ্ব ইতিহাস-৩৯৪)

মনু শাস্ত্রে এও বলা হয়েছে যে, "অনুগত স্ত্রী হলো সে, যে তার স্বামীর সেবা এভাবে করে যেন সে তার প্রভু। তার ব্যাপারে এমন কোনো কথা না বলে যা তার জন্য দুঃখজনক হয়, তা তার স্বামী বড় লম্পট আর বদমাশই হোক না কেন। কেননা, কেবল ওই জন্যেই নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর যখন সে তার স্বামীকে ডাকবে তখন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে 'হে আমার উপাস্য' বলে ডাকবে। কিছু দূরত্ব বজায় রেখে তার পিছু পিছু চলবে এবং স্বামী তার সাথে বেশি থেকে বেশি একটিমাত্র কথা বলবে। নারী স্বামীর সাথে খাবার গ্রহণ করবে না; বরং স্বামীর উচ্ছিষ্ট সে খাবে।

এছাড়াও মধ্যযুগীয় এবং স্মৃতিশাস্ত্রীয় হিন্দু সমাজে নারীর শিক্ষার অধিকারকে ধর্মীয়ভাবে সংকুচিত করা হয়েছিল। মনুস্মৃতির বিধান অনুযায়ী, নারীদের জন্য 'উপনয়ন' (শিক্ষার হাতেখড়ি) নিষিদ্ধ ছিল। তাদের জন্য বিবাহকেই 'গুরুগৃহ' বা শিক্ষার বিকল্প ধরা হতো।যার ফলে বেদ পাঠ এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ থেকে তাদের

দূরে রাখা হতো, যা তাদের বৌদ্ধিক বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রেফারেন্স: মনুস্মৃতি ৯/১৮ (যেখানে নারীকে মন্ত্রহীন এবং অশুভ বলা হয়েছে)।

হিন্দু নারীরা সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। প্রাচীন 'দায়ভাগ' ও 'মিতাক্ষরা' আইন অনুযায়ী, সম্পত্তিতে কন্যার কোনো স্থায়ী অধিকার ছিল না। একজন বিধবা তার স্বামীর সম্পত্তির কেবল 'জীবনস্বত্ব' (Life Interest) পেতেন। অর্থাৎ, তিনি সেটা ভোগ করতে পারতেন কিন্তু বিক্রি বা দান করার অধিকার রাখতেন না। পিতার সম্পত্তিতেও ভাইয়ের উপস্থিতিতে বোন কিছুই পেতেন না। রেফারেন্স: মনুস্মৃতি ৮/৪১৬ এবং জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ' শাস্ত্র।

রাজনৈতিক ও বিচার বিভাগীয় বঞ্চনা (Political & Legal Limitations)ও শিকার হতেন তখনকার নারীরা।সামাজিক নীতি নির্ধারণ এবং বিচার ব্যবস্থায় নারীর কোনো কণ্ঠস্বর ছিল না। রাজনীতি এবং রাজকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে নারীদের অযোগ্য মনে করা হতো।আদালতে নারীর সাক্ষ্যকে পুরুষের সমান গুরুত্ব দেওয়া হতো না। বিশ্বাস করা হতো নারীরা চপলমতি, তাই তারা সঠিক সাক্ষ্য দিতে অক্ষম। রেফারেন্স: মনুস্মৃতি ৮/৬৮।

বিবাহিত জীবনে একজন নারীর নিজস্ব কোনো সত্তা বা অধিকার স্বীকৃত ছিল না। হিন্দু বিবাহ ছিল একটি অলঙ্ঘনীয় চুক্তি (Sacrament), যেখানে নারীর 'তালাক' বা বিবাহবিচ্ছেদের কোনো অধিকার ছিল না। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে সহমরণে যেতে বাধ্য করা হতো (সতীদাহ প্রথা), অথবা তাকে চিরকাল নিরামিষাশী হয়ে অমানবিক বিধবা জীবন কাটাতে হতো। অন্যদিকে, পুরুষের বহুবিবাহ শাস্ত্রীয়ভাবে বৈধ ছিল।রেফারেন্স: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ' বিষয়ক প্রবন্ধ।

সতীদাহ প্রথার সংজ্ঞা ও উৎপত্তি

সতীদাহ প্রথা হিন্দু ধর্মের ইতিহাসের একটি অন্ধকার এবং বিতর্কিত অধ্যায়। এটি মূলত মৃত স্বামীর চিতায় জীবন্ত বিধবা স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার একটি প্রথা।

'সতী' শব্দটি এসেছে দক্ষরাজার কন্যা সতী (পার্বতী) থেকে, যিনি পতি-নিন্দার প্রতিবাদে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তবে মূল পুরাণে সতী স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিলেও, মধ্যযুগীয় সমাজে এটি একটি বাধ্যতামূলক প্রথায় পরিণত হয়। আর এই জঘন্য প্রথা কে বাস্তব এ রূপ দেওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রে বিধবা নারী যাতে চিতা

থেকে পালাতে না পারে, সেজন্য তাকে নেশাজাতীয় দ্রব্য খাইয়ে আচ্ছন্ন করে রাখা হতো। চিতার চারদিকে বাঁশ দিয়ে চেপে ধরা হতো এবং ঢাক-ঢোল বাজানো হতো যাতে নারীর আর্তচিৎকার কেউ শুনতে না পায়। যদি বিধবা স্ত্রী বেঁচে থাকতেন, তবে তাকে স্বামীর সম্পত্তির ভাগ দিতে হতো। তাকে পুড়িয়ে মারলে সম্পত্তি দেবর বা অন্যান্য আত্মীয়দের অধীনে চলে যেত। ঐতিহাসিকদের মতে, সম্পত্তি দখল এবং বিধবার ভরণপোষণের দায়িত্ব এড়াতে সমাজ এই অমানবিক প্রথাকে ধর্মের নামে বৈধতা দিয়েছিল।

বৌদ্ধ ধর্মে নারী

বৌদ্ধ ধর্মে নারীদের অবস্থান ও ছিল অত্যন্ত করুণ। বৌদ্ধরা নারী জাতিকে সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখতেন। তাদের সমাজে নারীদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। হিন্দু সমাজের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্মেও মেয়ের জন্ম অলুক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হত। মেয়েরা এত স্বল্প মূল্যের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হত যে, তাদের কোন ভাল নামও রাখা হত না। জাপানেও সে সময় কন্যাকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট মনে করা হত। পিতা কন্যাকে সাময়িকভাবে বেশ্যালয়ে বিক্রয় করতে বা অন্যের নিকট ভাড়া দিতে পারতেন। তারা পূজা-অর্চনায় যোগদান বা স্বাধীনভাবে ধর্মালোচনা করতে পারত না। মন্দিরে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ বৌদ্ধরা নারী মর্যাদায় আগ্রহী ছিল না। বরং কিভাবে নারীদেরকে অবমূল্যায়ন করা যায় সে ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। রায় দীনেশ চন্দ্র বাহাদুরসহ অনেকেই বৌদ্ধ সমাজে নারীর অবনতির আরো ভয়াবহ চিত্র অংকিত করে গেছেন।

নারীদের স্বভাব সম্পর্কে জাতক কাহিনীগুলোতে সন্ন্যাসীদের সতর্ক করতে গিয়ে প্রায়ই কঠোর উক্তি করে বলা হয়েছে __"*নদী, রাজপথ, পানশালা এবং সভার মতো নারীরাও সবার জন্য সাধারণ। তারা আগুনের মতো দাহ্য এবং বিষধর সর্পের মতো বিপজ্জনক।" (ইত্থি-জাতক)*

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মতে নারী হল সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। এ তথ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়েষ্টারমার্ক ডবংঃৎসধৎশ বলেন, মানুষের জন্য প্রলোভন যতগুলো ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে তন্মধ্যে নারী-ই সর্বাপেক্ষা বিপদ জনক।

নারীর মধ্যে মহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে। যা সমগ্র বিশ্বের মনকে অন্ধ্য করে দেয়। বুদ্ধদেব স্বয়ং স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী জীবন-যাপন করেন। নারীদেরকে তিনি মোহের বাস্তব স্বরূপ ও মানবাত্মার নির্বাণ লাভে বিঘ্ন বলে মনে করতেন। বিবাহ ও তার আনুসাঙ্গিক কার্যকলাপ বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্যের পরিপন্থী। এ ধর্মের লক্ষ্য হল, সকল বাসনা-কামনার বিলুপ সাধণ। সুতরাং এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে চির কৌমার্য আবশ্যক।

গৌতম বৌদ্ধের দৃষ্টিতে 'নারীরা পুরুষের মোক্ষ লাভের অন্তরায়, তাদের সাহচর্যে থেকে আত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়।' মানবতাবাদী হওয়া সত্ত্বেও গৌতম বৌদ্ধ নারীদেরকে অস্পৃশ্য ও উপেক্ষার বস্তু মনে করে অমানবিকতার নজীর স্থাপন করেছেন।

ইহুদী ধর্মে নারী

ইয়াহুদী ধর্মের কিতাবে মুকাদ্দাস (বাইবেলে) নারী সম্পর্কে অভিমত হল এই- সে কে? যে নাপাক থেকে পাক বের করবে। নেই কেউ। (আইউব-অধ্যায় ১৪)

অন্যত্র রয়েছে, এমন মানুষ কে, যে পাক হতে পারে? যে নারী থেকে জন্ম নিয়েছে সে কি করে সত্যবাদী হতে পারে? অর্থাৎ, ইয়াহুদী ধর্মের দৃষ্টিতে ১. নারী নাপাক। ২. নারী সত্তার মধ্যে সত্যবাদীতা নেই। এ কারণে তার থেকে যার জন্ম, সে সত্যবাদীতা শূণ্য। ৩. মানুষ যেহেতু নারী থেকে জন্ম, তাই সে পবিত্র হতে পারে না। কেননা, নারীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব নাপাক। অতএব এমন কে রয়েছে, যে নাপাক থেকে পাক বের করতে পারে?

ইয়াহুদী চিন্তা ধারায়, ইভ বা হাওয়া (আ.)-কে শয়তানের প্ররোচনায় সাড়া দিয়ে আদম (আ.)-কে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ানোর জন্য দায়ী করা হয়। এই 'অরিজিনাল সিন' বা আদি পাপের ধারণা থেকে পরবর্তীকালে নারীদের সম্পর্কে একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছিল যে, তারা প্রলুব্ধকারী বা জন্মগতভাবে দুর্বল।

প্রাচীন ইয়াহুদী সমাজ ছিল অত্যন্ত পুরুষতান্ত্রিক। তালমুদ (Talmud - ইয়াহুদী আইন ও ঐতিহ্যের সংকলন) এবং প্রাচীন আইন অনুযায়ী, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদের আইনি সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্যতা ছিল না [২]। তাদের কথাকে পুরুষদের মতো বিশ্বাসযোগ্য মনে করা হতো না। ইহুদি ধর্মে (বিশেষ করে প্রাচীন এবং অর্থোডক্স প্রথা অনুযায়ী)

নারীরা ধর্মীয়, সামাজিক এবং আইনি ক্ষেত্রে আরও বেশ কিছু কঠোর বৈষম্যের শিকার হতেন।

ইহুদি ধর্মীয় আইন বা 'হালাখা' অনুযায়ী নারীদের জন্য অনেক ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা শিথিল করা হয়েছিল, যা প্রকারান্তরে তাদের ধর্মীয় মর্যাদা কমিয়ে দিয়েছিল।এমনকি নারীদের জন্য তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তোরাহ পাঠ নিষিদ্ধ ছিল। ইহুদি আইনে বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে চরম বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। ইহুদি আইন অনুসারে, শুধুমাত্র স্বামীই তার স্ত্রীকে ডিভোর্স বা 'গেট' (Get) দিতে পারেন। স্ত্রী চাইলেও স্বামীকে ডিভোর্স দিতে পারেন না।
আগুনা (Agunah) বা 'শিকলবন্দী' নারী অর্থাৎ যদি কোনো স্বামী নিখোঁজ হন বা জেদ করে স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে অস্বীকার করেন, তবে ওই নারী সারাজীবন 'আগুনা' হয়ে থাকেন। তিনি অন্য কোথাও বিয়ে করতে পারতেন না, অথচ স্বামী চাইলে অন্য নারী গ্রহণ করতে পারতেন।

বাইবেলের বিধান অনুযায়ী (গণনা পুস্তক ২৭:৮), উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে প্রথম অধিকার পুরুষের। যদি কোনো ব্যক্তির পুত্র সন্তান থাকে, তবে কন্যারা পিতার সম্পত্তির কোনো অংশ পেতেন না। সম্পত্তি কেবল তখনই কন্যাদের দেওয়া হতো যদি ওই ব্যক্তির কোনো পুত্র সন্তান না থাকত। বিয়ের পর স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর স্বামীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতো। এছাড়া তালমুদ (Talmud - ইয়াহুদী আইন ও ঐতিহ্যের সংকলন) এবং প্রাচীন ইহুদি আইন অনুযায়ী, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদের আইনি সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্যতা ছিল না [২]। তাদের কথাকে পুরুষদের মতো বিশ্বাসযোগ্য মনে করা হতো না। চুরি, ডাকাতি বা খুনের মতো গুরুতর অপরাধে একজন নারীর সাক্ষ্যকে গুরুত্বহীন মনে করা হতো। তাদের সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্যতাকে দাস বা শিশুদের সমতুল্য ধরা হতো।
ঐতিহাসিকভাবে ইহুদি সমাজে নারীদের ধর্মীয় শিক্ষা বা 'তালমুদ' শিক্ষা থেকে দূরে রাখা হতো। অনেক রাব্বির মতে, "যে তার কন্যাকে তোরাহ বা ধর্মগ্রন্থ শিক্ষা দেয়, সে তাকে অশ্লীলতা শেখানোর সমান।" ফলে নারীরা কেবল ঘরকন্নার কাজে সীমাবদ্ধ থাকতেন। এমনকি নারীর ঋতুস্রাব চলাকালীন (Niddah) তাকে কেবল অশুচিই মনে করা হতো না, বরং তার ছোঁয়া লাগা প্রতিটি বস্তুও অপবিত্র মনে করা হতো। এই

সময়ে স্বামী তার স্ত্রীর পাশে বসতে বা তার হাত থেকে কোনো বস্তু গ্রহণ করতে পারতেন না। সাত দিন পর একটি বিশেষ ধর্মীয় স্নান (Mikvah) করার আগ পর্যন্ত নারীকে সামাজিকভাবে প্রায় একঘরে করে রাখা হতো।

খ্রিস্টান ধর্মে নারী

আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে সভ্যতার দাবীদার খৃষ্টধর্মও নারীদেরকে করেছে চরম অবমূল্যায়ন। খৃষ্টানরা নারী জাতিকে পাপের প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।হাওয়া (Eve) আগে নিষিদ্ধ ফল খেয়েছেন—এই একটি অজুহাতে কয়েক হাজার বছর ধরে খ্রিস্টান নারীদের 'নৈতিকভাবে দুর্বল' এবং 'প্রলুব্ধকারী' হিসেবে দেখা হয়েছে। ২য় শতাব্দীর বিখ্যাত খ্রিস্টান পণ্ডিত টারটুলিয়ান (Tertullian) নারীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন— "তোমরা শয়তানের প্রবেশদ্বার... তোমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি পুরুষকে ধ্বংস করেছ।"

পণ্ডিতরা বাইবেলের আদিপুস্তকের একটি শ্লোক (৩:১৬) ব্যবহার করে দাবি করতেন যে, হাওয়ার পাপের শাস্তি হিসেবেই আজীবন সমস্ত নারী পুরুষদের অধীনে থাকতে বাধ্য। "যেহেতু হাওয়া আদমকে পাপে লিপ্ত করেছিলেন, তাই দণ্ডস্বরূপ নারীকে পুরুষের শাসনের অধীনে রাখা হয়েছে। এটি কোনো আশীর্বাদ নয়, এটি তার আদি পাপের চিরস্থায়ী সাজা।" বলেছেন জন ক্যালভিন (John Calvin)।তীমথিয় ২:১২ শ্লোকটিতে বলা হয়েছে— "আমি নারীকে শিক্ষা দেওয়ার বা পুরুষের ওপর কর্তৃত্ব করার অনুমতি দিই না; তাকে নীরব থাকতে হবে।"

এটা শুধুই একটি শ্লোক নয় বরং এটিকে চিরন্তন আইন হিসেবে তৎকালীন পন্ডিতরা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেন্ট অগাস্টিন মনে করতেন "নারী একা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি নয়, বরং সে পুরুষের সাথে যুক্ত হলেই কেবল পূর্ণতা পায়।"

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রভাবশালী পণ্ডিত টমাস অ্যাকুইনাস তার 'Summa Theologica'-তে লিখেছিলেন যে, "নারী হলো একটি 'অসম্পূর্ণ পুরুষ' (defective male) এবং প্রকৃতির একটি ভুল।"

এভাবেই রীতিমতো পন্ডিতরা নারীদের অস্তিত্বকে অপমানিত করেছে তাদের বিভিন্ন লেখায়।

তাছাড়া প্রসব বেদনাকে ও পাপের প্রতীক হিসেবে দেখা হতো। পণ্ডিতরা প্রচার করতেন যে, নারীরা সন্তান প্রসবের সময় যে অসহ্য যন্ত্রণা পায়, তা আসলে হাওয়ার করা সেই আদি পাপের সরাসরি শাস্তি। এব্যাপারে অনেক মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান পণ্ডিত মনে করতেন, নারীদের এই কষ্ট পাওয়া উচিত কারণ তারা হাওয়ার বংশধর। এমনকি আধুনিক যুগে যখন ক্লোরোফর্ম বা ব্যথানাশক ওষুধ আবিষ্কার হয়, তখন অনেক রক্ষণশীল যাজক এর বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে— "নারীদের ব্যথামুক্ত করা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া, কারণ ঈশ্বর হাওয়াকে ব্যথার অভিশাপ দিয়েছিলেন।" তারা মনে করে মা হযরত হাওয়া আ. এর ভুলের কারণে নারীরক্তে পাপ স্থায়ীভাবে স্থান করে নিয়েছে। সেন্ট বার্নার্ড, সেন্ট সিপ্রিল, সেন্ট গ্রেগরী, সেন্ট জিরাম প্রমুখ খৃষ্টান মনীষী নারী চরিত্রের যে কলঙ্কজনক চিত্র এঁকেছেন তা নিতান্তই দুঃখজনক।

তারা লিখেছেন,'নারী শয়তানের শক্তি, অজগর সাপের মতো রক্তপিপাসু, তার মধ্যে পাপের বিষ নিহিত আছে।' এছাড়া আরো বলেন "নারীকে লজ্জায় মরে যাবার জন্যে এতটুকু কথাই যথেষ্ট যে, সে নারী। তাছাড়া মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর মতো অবমাননার কারণও এই নারী।"

এছাড়া খৃষ্টান ধর্মে তালাকের কোন ব্যবস্থা নেই। নারীর কোন অর্থনৈতিক অধিকারও নেই। এমনকি বিয়ের পর নারীর সব সম্পত্তির মালিক হয়ে যায় তার স্বামী। এভাবে সভ্যতার দাবীদার খৃষ্টধর্ম নারীদেরকে করেছে নিগৃহিত ও নিষ্পেষিত।

বিভিন্ন প্রাচীন ধর্ম ও সমাজে এই-ই ছিল নারীর অবস্থান। কোথাও মানবিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা স্বীকৃত ছিল না। এভাবেই নারীরা যুগে যুগে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন।

সভ্যতার নামে জাহিলিয়্যাত

রোমান সভ্যতায় নারী

রোমান সভ্যতাকে পাশ্চাত্য পদ্ধতির গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়। তা সত্বেও এই সমাজে নারীদের নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হতে হয়। সর্বদাই ক্ষমতাধর পুরুষদের

কবলে জিম্মি হয়ে থাকতে হতো নারীদের কে। নারীরা সাধারণত রাজনৈতিক ,অর্থনৈতিক , সামাজিক আইনগত , শিক্ষা ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো।রোমান সমাজে নারীরা কোনো সরকারি পদে থাকতে পারতেন না এবং তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না। সব ধরনের অধিকার এবং একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক হতেন রোমান সভ্যতার পুরুষেরা। তারা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু আর পাগলের মতো নারীকেও মনে করতেন অযোগ্য ও অক্ষম। নারী হয়ে জন্মে নেওয়াই ছিল তার অযোগ্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এমনকি যা বাবার কাছ থেকে বিয়ের যৌতুক বা পিতার হিসেবে পাওয়া সম্পত্তিতেও নারীর কোনো অধিকার ছিল না। স্বামীর ঘর করার সাথে সাথে স্ত্রীর সব ব্যক্তিগত সম্পদও স্বামীর মালিকানায় চলে যেতো। রোমান নারী আদালতে বিচার প্রার্থনার অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল, এমনকি তার সাক্ষী দেওয়ার অধিকার ছিল না। রোমান সমাজে'সর্দারি বিয়ে' নামে এক ধরনের বিয়ে-শাদীরও প্রচলন ছিল। এর মাধ্যমে যেকোনো নারী সর্দারের স্ত্রী বলে গণ্য হতো এবং একবার কেউ সর্দারি বিয়ের কবলে পড়লে তাকে তার সাবেক পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যেতে হতো এবং কখনো তার ওপর কোনো অভিযোগ আনা হলে তাকে সর্দারের সামনে পেশ করা হতো যেন নিজ হাতে তার শাস্তি দিতে পারে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো সর্দার অভিযুক্ত নারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকারও রাখতো, যেমন বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে। এছাড়া কোনো মহিলার স্বামী মারা গেলে, তার বিধবা স্ত্রী ছেলেদের উত্তরাধিকারে পরিণত হতো, যদি পুত্রসন্তান না থাকতো তাহলে বিধবাটি স্বামীর ছোটভাই বা চাচার অধিকারে চলে যেতো।

উল্লিখিত বৈষম্য ছাড়াও রোমান সভ্যতায় নারীরা নানাবিধ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক নির্যাতনের শিকার হতেন। তখনকার সমাজব্যবস্থায় পুরুষ কর্তৃক নারীর এই নির্যাতনগুলো ছিল খুবই সাধারণ বিষয়।

রোমান সমাজে পারিবারিক সহিংসতা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। ‘প্যাটার ফ্যামিলিয়াস’ প্রথার অধীনে স্বামী তার স্ত্রীকে শাসন করার জন্য শারীরিক প্রহার করতে পারতেন । এমনকি তুচ্ছ কারণেও স্ত্রীকে মারধর করা বা জখম করা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল । অনেক ক্ষেত্রে এই সহিংসতা মৃত্যুর কারণ হতো। সম্রাট নিরোর

দ্বিতীয় স্ত্রী পপিয়া সাবিনা অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন তার স্বামীর লাথির আঘাতে মারা যান বলে জানা যায় । তাছাড়া রোমান পরিবারে কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়াকে অনেক সময় বোঝা মনে করা হতো। অনেক বাবা-মা নবজাতক মেয়েদের জনমানবহীন স্থানে ফেলে আসতেন ,যাতে তারা ক্ষুধা বা বন্য প্রাণীর শিকারে মারা যায় । যেহেতু বিয়ের সময় মেয়ের পরিবারকে বিপুল পরিমাণ যৌতুক দিতে হতো। তাই এই আর্থিক চাপ এড়াতে অনেক পরিবারে কন্যাসন্তান হত্যা করা হতো ।

রোমান নারীদের একটি বড় অংশ ছিল ক্রীতদাসী, যাদের জীবনের কোনো মূল্য ছিল না। নারী দাসীদের ওপর তাদের মালিকদের সম্পূর্ণ যৌন অধিকার ছিল। মালিকরা যখন খুশি তাদের যৌনকাজে বাধ্য করতে পারত এবং এতে আইনি কোনো বাধা ছিল না । অনেক সময় গৃহকর্ত্রীর ঈর্ষার কারণেও নারী দাসীরা ভয়াবহ শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতো । যৌন আচরণের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন আইন। যদি কোনো বিবাহিত নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হতেন, তবে স্বামী বা পিতা তাকে হত্যা করার আইনি অধিকার রাখতেন । কিন্তু স্বামী যদি দাসী বা বারবণিতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন, তবে তাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো না ।
অবিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রেও যৌন শুদ্ধতা রক্ষা করা ছিল বাধ্যতামূলক। পবিত্র ‘ভেস্টাল ভার্জিন’রা যদি কৌমার্য হারাতেন, তবে তাদের জীবন্ত সমাহিত করা হতো । নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া ছিল নিয়মিত ঘটনা। অনেক সময় রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক লাভের জন্য নারীদের এক স্বামী থেকে অন্য স্বামীর কাছে হস্তান্তরিত করা হতো । স্বামীর ঘর করার সময় নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বা গয়নাগাটির ওপরও নারীর নিয়ন্ত্রণ থাকতো না; স্বামী চাইলে সেগুলো বিক্রি বা দান করে দিতে পারতেন ।

সারকথা হলো রোমান সভ্যতায় নারীর নিরাপত্তা নির্ভর করত তার সামাজিক অবস্থানের ওপর। অভিজাত পরিবারের নারীরা কিছুটা মর্যাদা পেলেও, সাধারণ নারী এবং দাসীদের জীবন ছিল শারীরিক লাঞ্ছনা ও শোষণে পরিপূর্ণ ।

গ্রীক সভ্যতায় নারী:

গ্রীক সভ্যতায় নারীদের অবস্থা কেমন ছিল তা জানার জন্য সক্রেটিসের একটি মাত্র উক্তির দিকে তাকালেই স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। সক্রেটিস বলেছিলেন, "নারী জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায় যা বাহ্যত খুব সুন্দর দেখা যায়। কিন্তু চড়ুই পাখি তা ভক্ষণ করলে তার মৃত্যু অনিবার্য।"

এন্ডাসকি অহফবৎড়ংশু বলেন, "অগ্নিতে দগ্ধ রোগী ও সর্প দংশিত ব্যক্তির আরোগ্য লাভ সম্ভব। কিন্তু নারীর যাদু প্রতিরোধ করা সম্ভব নহে।"

তখনকার সময়ে নারীকে একান্ত অর্থহীন দ্রব্যের মতো ঘরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখা হতো। এমনকি বড় বড় গ্রিক দার্শনিক ও চিন্তাবিদরাও মনে করতেন যে, নারীর অস্তিত্বের মতো নারী নামটাকেও যেন বদ্ধঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়।

তারা নারীকে কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বলে মনে করতো। এ ছাড়া নারীর যদি অন্য কোনো কাজ থেকেই থাকে তাহলে তা এই যে, সে স্বামী এবং অন্যান্য পুরুষদের সেবা করবে। 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা' এ কথাটি ছিল গ্রিকদের জন্যে একান্ত দুর্বোধ্য কথা। অবশ্য প্রেম ভালোবাসার জন্যে তাদের আলাদা ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যাপারে চমৎকার চিত্রাঙ্কন করেছেন প্রখ্যাত গ্রিক চিন্তাবিদ ডেমোস্তিন। তিনি বলেন: "আমরা যৌনতৃপ্তি অর্জনের জন্যে বেশ্যালয়ে যাই এবং আমাদের দৈনন্দিন কর্মসূচি তৈরি করে থাকে বালিকা বন্ধুরাই আর আমরা কেবল আইনগতভাবে সন্তান উৎপাদনের জন্যেই স্ত্রী গ্রহণ করি।"

এজন্যে বিয়ের পর মেয়েরা পিতার ঘর ছেড়ে স্বামীর ঘরে চলে আসে; কিন্তু তা এজন্যে নয় যে, সে স্বামীর ঘরের কর্ত্রী হবে। তা নয়; বরং স্বামীর ঘরে তাকে আসতে হয় শুধু সে সেবিকার দায়িত্ব পালন এবং সন্তান উৎপাদন ও তার লালন-পালনের জন্যেই।

প্রাচীন গ্রীসে বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের সম্মতি নেওয়া হত না। বরং মা-বাবার ইচ্ছানুসারে তাকে বাধ্য করা হত। বর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকলেও মাতা-পিতার নির্দেশে নারী তাকে স্বামী ও প্রভুরূপে বরণ করতে বাধ্য হত। নারীদেরকে নিতান্ত নগন্য বলে গণ্য করা হত এবং সর্বদা তাদেরকে পুরুষ আত্মীয়-স্বজন, পিতা, ভাই, চাচা, মামা, খালুকে মেনে চলতে হত।

প্রাচীন গ্রিক সমাজে নারীরা শিক্ষা, রাজনীতি, সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাসহ প্রায় সকল মৌলিক অধিকার থেকেই বঞ্চিত ছিল।

চীন সভ্যতায় নারী

পৃথিবীর ইতিহাসে চীনে নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। মর্যাদার দিক থেকে তাদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। চীনা সমাজে নারীদের সামাজিক অবস্থান ও ছিল বেদনাদায়ক এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল অবমাননাকর।

চীনারা তাদের নারীদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতো। উচ্চপর্যায়ের এক চীনা মহিলা নিজ সমাজে নারীর অবস্থান নির্ধারণ প্রসঙ্গে লেখেন- "আমাদের নারীদের স্থান হচ্ছে মানবতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান এবং এজন্যেই আমাদের অংশে এসেছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কর্ম।"

তারই এক নীতিকথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে- "নারী কতো হতভাগিনী! পৃথিবীতে তার মতো মূল্যহীন দ্রব্য আর কিছু নেই। ছেলেরা দোরমুখে এমনভাবে দাঁড়ায় যেন তারা আকাশ থেকে আগত কোনো দেবতা; কিন্তু মেয়েদের জন্মমুহূর্তেও আনন্দের সানাই বাজে না। যখন তারা বড় হয়ে ওঠে তখন বদ্ধ ঘরে লুকিয়ে রাখা হয় যেন কোনো মানুষ তাকে দেখতে না পায়, আর যখন সে নিজ গৃহ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন তার জন্যে দুফোঁটা অশ্রু ফেলার মতো কেউ থাকে না।"

চীন ধর্ম গ্রন্থে নারীকে ডধঃবৎং ড়ভ ড়িব (দুঃখের প্রস্রবণ) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। চীন দেশে নারীদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে জনৈকা চীন দেশীয় নারী বলেন, “মানব সমাজে নারীদের স্থানই সর্বনিম্নে।... অদৃষ্টের কি নির্নম পরিহাস নারী সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণী। জগতে নারী অপেক্ষা নিকৃষ্ট আর কিছুই নেই।”

বিয়ের ক্ষেত্রেও নারীর মতামতের কোনো গুরুত্ব ছিল না। পরিবারই বিয়ে ঠিক করত এবং অনেক সময় কন্যা সন্তানকে “অন্য পরিবারের হয়ে যাওয়া ব্যক্তি” হিসেবে দেখা হতো।নারীরা কখনো কোন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারতো না।এমনকি তার সন্তানদের উপরও তার কোন অধিকার থাকতো না। স্বামীর যখন ইচ্ছা তাকে তালাক দিয়ে দিতে পারতো এবং অপরের উপপত্নী রূপে তাকে বিক্রয়ও করতে পারতো। বিধবা হলে তাকে স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিরূপে জীবন যাপন করতে হত এবং পুন: বিবাহ প্রায় অসম্ভব ছিল।

শিক্ষা ও ক্ষমতার ক্ষেত্রেও নারীরা পিছিয়ে ছিল। সাধারণভাবে তারা উচ্চশিক্ষা বা সরকারি চাকরির সুযোগ পেত না। সম্পত্তির উত্তরাধিকারও প্রধানত ছেলেরা পেত, তাই নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কম ছিল।

কিছু অঞ্চলে "পায়ের বাঁধন" (foot binding) নামের একটি কঠিন প্রথা ছিল। এতে ছোট বয়সে মেয়েদের পা শক্তভাবে বাঁধা হতো, যা তাদের চলাফেরা সীমিত করত। এটিকে সৌন্দর্যের প্রতীক মনে করা হলেও এটি ছিল খুব কষ্টদায়ক একটি প্রথা।

সব মিলিয়ে প্রাচীন চীনে নারীরা পরিবার ও সমাজে পুরুষদের অধীনে একটি সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত অবস্থানে ছিল।

প্রাচীন পারস্য (পারসিক সভ্যতা)

পারস্য সাম্রাজ্যে রাজকীয় নারীরা কিছু সুবিধা পেলেও সাধারণ নারীরা সমাজে ছিল চরম বৈষম্যের শিকার।জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়া হতো। তখনকার নারীদের মতামত প্রকাশের কোন স্বাধীনতা ছিল না।নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া ছিল সাধারণ ঘটনা।

এই নারীদের অনেকটাই একঘরে করে রাখা হতো। উচ্চবিত্ত পরিবারের নারীদের বাইরে বের হওয়া নিষিদ্ধ ছিল এবং তাদের কঠোর পর্দার আড়ালে থাকতে হতো (যাকে 'হারেম' প্রথা বলা হয়)।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় সভ্যতায় নারীদের অবস্থা

মধ্যযুগের ইউরোপে নারী (অন্ধকার যুগ ও ডাইনি শিকার) : মধ্যযুগে ইউরোপীয় সমাজ এবং তৎকালীন চার্চ নারীদের প্রতি অত্যন্ত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করত।

ডাইনি শিকার (Witch Hunt) ছিল ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। ১৫শ থেকে ১৭শ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে হাজার হাজার নারীকে 'ডাইনি' অপবাদ দিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়। কোনো নারী একটু বুদ্ধিমান হলে, ভেষজ চিকিৎসা জানলে বা স্বাধীনচেতা হলে তাকে শয়তানের উপাসক মনে করা হতো। আত্মা নিয়ে ৫৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের 'ম্যাকন কাউন্সিল'-এ যাজকরা দীর্ঘ বিতর্ক করেছিলেন যে—"নারীর কি আদৌ কোনো আত্মা আছে?" দীর্ঘ আলোচনার পর তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, নারীর আত্মা থাকলেও তা পুরুষের চেয়ে নিম্নমানের। আইনের ক্ষেত্রে ও তৎকালীন 'ইংলিশ কমন

ল' অনুযায়ী, একজন নারী বিয়ের পর তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাত। তার নাম, সম্পত্তি এবং এমনকি নিজের দেহটিও স্বামীর সম্পত্তিতে পরিণত হতো।
পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো নারীকে।মধ্যযুগের অনেক বাজারে নারীদের গবাদি পশুর মতো বিক্রির প্রথাও প্রচলিত ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে ও নারীরা বঞ্চনার শিকার হত। তখনকার ইউরোপে নারীদের শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকার ছিল না।এমনকি নারীদের জন্য বই পড়া কে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

প্রাচীন মেসোপটেমিয়া (ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় সভ্যতা)

হাম্বুরাবির আইন এবং আসিরীয় আইনে নারীর প্রতি অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। যদি কোনো নারী তার স্বামীর অবাধ্য হতো, তবে স্বামী তার স্ত্রী কে পানিতে ডুবিয়ে মারার বা প্রহার করার আইনি অধিকার পেতো।
কন্যাদের অনেক সময় দেনা শোধ করার মাধ্যম বা যুদ্ধের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতো।
আসিরীয় সভ্যতায় কেবল 'সম্মানিত' নারীদের পর্দা করার অনুমতি ছিল; দাসী বা যৌনকর্মীদের জন্য পর্দা করা ছিল দণ্ডনীয় অপরাধ।

প্রাচীন মেক্সিকো (অ্যাজটেক ও মায়া সভ্যতায়) নারী

আমেরিকার এই প্রাচীন সভ্যতাগুলোতেও নারীর ভূমিকা ছিল মূলত ঘরোয়া কাজে সীমাবদ্ধ। অনেক সময় দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে কুমারী মেয়েদের বলি দেওয়া হতো। রাজনীতি বা সামরিক বাহিনীতে নারীদের কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না, তাদের প্রধান কাজ ছিল সৈন্য তৈরি করা এবং গৃহস্থালি সামলানো।

ইসলাম-পূর্ব জাহিলি আরবে নারীর অবস্থান

আইয়ামে জাহিলিয়্যাতে নারীর সামাজিক অবস্থান

আইয়ামে জাহেলিয়া (Ayyām al-Jāhiliyyah) বলতে ইসলামের আবির্ভাব-পূর্ব আরব সমাজের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও নৈতিক অবক্ষয়ের যুগকে বোঝায়। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ

ﷺ-এর নবুয়ত লাভের পূর্ব পর্যন্ত আরব সমাজ যে সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল, তাকে আইয়ামে জাহেলিয়াত বলা হয়। এ যুগে আরবে পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার, নারী নির্যাতন, শিশু হত্যা, গোত্রীয় কলহ, মদ্যপান ও নৈতিক অবক্ষয় চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। আরব সমাজ গোত্রীয় প্রথা, সামাজিক বৈষম্য, শক্তিনির্ভর মানসিকতা ও কুসংস্কারের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো।
আরবের জনগণ বিভিন্ন শেণিতে বিভক্ত হয়ে বসবাস করতো। প্রতিটি শ্রেণির অবস্থা ছিল অন্য শ্রেণির চেয়ে আলাদা। অভিজাত শ্রেণিতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ছিল যথেষ্ট উন্নত। এ শ্রেণির মহিলাদের স্বাধীনতা ছিল অনেক। এদের কথার মূল্য দেয়া হতো। তাদের এতোটা সম্মান করা হতো এবং নিরাপত্তা দেয়া হতো যে, এরা পথে বেরোলে এদের রক্ষণের জন্যে তলোয়ার বেরিয়ে পড়তো এবং রক্তপাত হতো। কেউ যখন নিজের দানশীলতা এবং বীরত্ব প্রসঙ্গে নিজের প্রশংসা করতো তখন সাধারণত মহিলাদের সম্বোধন করতো। মহিলা ইচ্ছে করলে তাদের মধ্যে যুদ্ধ এবং রক্তপাতের আগুন জ্বালিয়ে দিতো। এসব কিছু সত্ত্বেও পুরুষদেরই মনে করা হতো পরিবারের প্রধান এবং তাদের কথা গুরুত্বের সাথে মান্য করা হতো। এ শ্রেণির মধ্যে নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক বিয়ের মাধ্যমে নির্ণীত হতো এবং মহিলাদের অভিভাবকদের মাধ্যমে এ বিয়ে সম্পন্ন হতো। অভিভাবক ছাড়া নিজের বিয়ে করার মতো কোন অধিকার নারীদের ছিল না।

সমাজে নারীদের অবস্থান ছিল সাধারণত দুর্বল ও অধিকারবঞ্চিত। যদিও কিছু নারী অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রভাবশালী ছিলেন, তথাপি অধিকাংশ নারী নিরাপত্তা, সম্মান এবং মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। নারীদের প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পুরুষকেন্দ্রিক এবং বৈষম্যমূলক।

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরবে নারীদের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক ছিল। তারা মানবরূপে পরিগণিত ছিল না। পুরুষ ও জীব জন্তুর মধ্যস্থলে ছিল তাদের বাসস্থান। তখনকার সময়ে এমন এক সমাজ ছিল যেখানে যুদ্ধবিগ্রহই তাদের নিত্যদিনের প্রধান কর্ম, সেখানে মেয়েদের ব্যাপারে তাদের এই বিরূপ মনোভাব ছিল স্বাভাবিক, কারণ তারা মনে করতো যুদ্ধ-বিগ্রহের ধকল সইবার ক্ষমতা শুধু পুরুষেরই থাকতে পারে । আর পুরুষের বীরত্বের মাধ্যমে ই গোত্রীয় মানমর্যাদা বজায় থাকে।

অন্যদিকে নারীদের ব্যাপারে ধারনা ছিল এরূপ যে, তারাতো এ ধরনের কোনো কাজেই আসতো না; বরং তারা ছিল শত্রুর লোভনীয় লক্ষ্য বস্তু। শত্রুরা তাদের মেয়েদের ক্রীতদাসীতে পরিণত করে তাদের সেবা এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহারও করতো। এভাবে মেয়েরা ছিল গোত্রের জন্য এক চিরস্থায়ী বোঝা। কারণ সবসময়ে মেয়েদের নিরাপত্তার বিষয়টি তাদের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। কেননা, তাদের মেয়ে শত্রুর অধিকারে যাওয়াটা ছিল গোত্রের জন্যে চরম অবমাননার বিষয়। এতেকরে তাদের মাথা নিচু হয়ে যেতো। কন্যা সন্তানের জন্ম সে দেশে চরম এক অভিশাপ বলে গণ্য হত। এমনকি আরবের অধিকাংশ লোক তাদের ঘরে মেয়ে সন্তানের জন্ম হওয়ার খবর পেয়ে দস্তুরমতো দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তো। কোনো কোনো গোত্রের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, যদি কারো ঘরে মেয়ের জন্ম হতো তখন সে তীব্র মর্মযাতনা অনুভব করে এটা ভাবতো যে, এমন দুঃখজনক ও লজ্জাকর অবস্থার পরও মেয়েটিকে রেখে দেবে, নাকি অপমানের এই প্রতীকটিকে হত্যা অথবা জীবন্ত পুঁতে দেবে! অনেক লোক এই শেষ সিদ্ধান্তটিই কার্যকরী করতো, অর্থাৎ মেয়ে সন্তানটিকে জীবন্ত পুঁতে দিতো। এই নিষ্ঠুর ঘটনাবলির দিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনে সূরা আন্-নহল: ৫৮-৫৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

অর্থঃ “যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হতো, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যেত এবং সে অন্তর্দাহে দগ্ধ হতে থাকত। যে সংবাদ তাকে দেওয়া হয়েছে তার লজ্জায় সে লোকদের কাছ থেকে আত্মগোপন করত। সে চিন্তা করত, অপমান সত্ত্বেও তাকে রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। জেনে রাখো, তাদের সিদ্ধান্ত কতই না নিকৃষ্ট!”

— (সূরা আন-নাহল: ৫৮–৫৯)

নারীদের উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চনা

আইয়ামে জাহেলিয়াত যুগে নারীরা সাধারণত উত্তরাধিকার লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। সম্পদ ও সম্পত্তির মালিকানা কেবল পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

নারীরা পিতা বা স্বামীর সম্পদে অংশীদার হতে পারতেন না এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদেরকে সম্পত্তির অংশ হিসেবেই গণ্য করা হতো।কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার স্ত্রীকে উত্তরাধিকারীরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিত। তারা চাইলে তাকে বিবাহ করত অথবা অন্যত্র বিবাহ দিতে বাধ্য করত। এ প্রথা নারীর স্বাধীন সত্তা ও ব্যক্তিগত অধিকারের পরিপন্থী ছিল। ইসলাম পরবর্তীতে নারীদের জন্য নির্ধারিত উত্তরাধিকার নিশ্চিত করে এবং তাদের স্বতন্ত্র সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃতি দেয়। এমনকি আরবে এই প্রথাও ছিল যে, যখন কোনো স্ত্রীর স্বামী মারা যেতো তখন তার বড় ছেলে দাঁড়িয়ে যেতো এবং তার পিতার স্ত্রীকে যদি নিজের জন্যে প্রয়োজন মনে করতো তাহলে তার ওপর নিজের জামা ছুঁড়ে মারতো এবং এভাবে সেই বিধবা তার একান্ত মালিকানায় এসে যেতো।

বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর স্বাধীনতার অভাব

জাহেলি সমাজে বিবাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ অভিভাবকদের সিদ্ধান্তনির্ভর ছিল। নারীদের মতামত বা সম্মতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো না। অনেক সময় নারীদের জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়া হতো কিংবা গোত্রীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হতো।

সে সময় বিভিন্ন ধরনের অনিয়ন্ত্রিত বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, যেমন বিনিময় বিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ এবং উত্তরাধিকারসূত্রে স্ত্রী গ্রহণ। এসব প্রথা নারীর স্বাধীন ব্যক্তিসত্তাকে অস্বীকার করে তাকে পুরুষের অধীন একটি উপকরণে পরিণত করেছিল। ইসলাম বৈধ বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর সম্মতিকে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এ অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে।

নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিবেচনা

আইয়ামে জাহেলিয়াত যুগে বহু ক্ষেত্রে নারীকে পূর্ণ মানবিক মর্যাদা দেওয়া হতো না। তাদের কে ভোগ্যপণ্য বা সামাজিক সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হতো। যুদ্ধের সময় নারীদের বন্দী করে দাসী বানানো এবং কেনাবেচা করা ছিল প্রচলিত রীতি। কিছু

গোত্রে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করা হতো এবং তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা স্বাধীনতার কোনো মূল্য দেওয়া হতো না।
এর ফলে নারীরা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক নির্যাতনের শিকার হতেন। তাদের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হতো পুরুষ অভিভাবকের অবস্থান ও ক্ষমতার ভিত্তিতে।

বহুবিবাহ ও পারিবারিক বৈষম্য

জাহেলি সমাজে বহুবিবাহের কোনো নির্দিষ্ট সীমা ছিল না। একজন পুরুষ ইচ্ছামতো বহু নারীকে বিবাহ করতে পারত। এর ফলে পারিবারিক জীবনে বৈষম্য, অবহেলা এবং অস্থিরতা সৃষ্টি হতো। বহুবিবাহ অনেক সময় গোত্রের শক্তি বৃদ্ধি, রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন কিংবা অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হতো।
এ ক্ষেত্রে নারীর মানসিক অধিকার ও ন্যায়বিচারের বিষয়টি খুব কম গুরুত্ব পেত। ইসলাম বহুবিবাহের ক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ করে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে বাধ্যতামূলক শর্ত হিসেবে ঘোষণা করে।

তালাক ব্যবস্থায় নারীর অসহায়ত্ব

জাহেলিয়াতে তালাকের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে পুরুষের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। পুরুষ চাইলে যেকোনো সময় স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারত, কিন্তু নারীর বিচ্ছেদের অধিকার ছিল অত্যন্ত সীমিত। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষেরা তালাক দিয়ে পুনরায় স্ত্রীকে ফিরিয়ে এনে দীর্ঘ অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখত।
এ পরিস্থিতিতে নারীরা সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও মানসিক অস্থিরতার শিকার হতেন। ইসলাম তালাক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং নারীদের জন্যও বিচ্ছেদের বৈধ সুযোগ প্রদান করে পারিবারিক সম্পর্ককে সুশৃঙ্খল করার চেষ্টা করে।

শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদায় সীমাবদ্ধতা

জাহেলি সমাজে অধিকাংশ নারী শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। সামাজিক নেতৃত্ব, বিচার, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ ছিল

সীমিত। নারীর পরিচয় প্রধানত পুরুষনির্ভর ছিল এবং তাদের স্বাধীন সামাজিক অবস্থান খুব কমই স্বীকৃত ছিল।
তবে কিছু ব্যতিক্রমী নারী ব্যবসা, সাহিত্য ও কবিতার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তবুও সামগ্রিকভাবে অধিকাংশ নারী সামাজিক বৈষম্যের শিকার ছিলেন। ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব আরোপ করে এবং নারীর মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে।

আইয়ামে জাহেলিয়াতে নারীদের সামাজিক অবস্থান ছিল সামগ্রিকভাবে দুর্বল, অনিরাপদ এবং অধিকারবঞ্চিত। কন্যাশিশু হত্যা, উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চনা, জোরপূর্বক বিবাহ, সীমাহীন বহুবিবাহ এবং সামাজিক অবমূল্যায়ন সে সময়ের সমাজব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। যদিও কিছু নারী অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রভাবশালী অবস্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন, তথাপি অধিকাংশ নারী বৈষম্য ও অনিরাপত্তার মধ্যে জীবনযাপন করতেন।
ইসলামের আবির্ভাবের মাধ্যমে নারীর মানবিক মর্যাদা, উত্তরাধিকার, সম্পত্তির অধিকার, বিবাহে সম্মতি এবং সামাজিক নিরাপত্তার মতো মৌলিক বিষয়গুলো নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে আরব সমাজে নারীর অবস্থানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটে।

জাহেলিয়াতের বিবাহ প্রথা

উম্মাহাতুল মু'মিনিন তথা মুমিনদের মাতা হযরত আয়েশা (রাঃ) আরবের বিবাহ বিষয়টি সহিহ আল-বুখারী কর্তৃক উরওয়াহ ইবনে আয-যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে স্পষ্ট করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁকে (নবীর স্ত্রী) জানান যে , জাহেলিয়াতের (ইসলাম-পূর্ব অজ্ঞতার যুগ) সময় চার ধরনের বিবাহ প্রথা ছিল:

১ম: এক প্রকার হচ্ছে, বর্তমান যে ব্যবস্থা চলছে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোন মহিলার অভিভাবকের নিকট তার অধীনস্থ মহিলা অথবা তার কন্যার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিবে এবং তার মোহর নির্ধারণের পর বিবাহ করবে।

২য়: দ্বিতীয় হচ্ছে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মাসিক ঋতু থেকে মুক্ত হবার পর এ কথা বলত যে, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাও এবং তার সঙ্গে যৌন মিলন কর। এরপর স্ত্রী তার স্বামীর থেকে পৃথক থাকত এবং কখনও এক বিছানায় ঘুমাত না, যতক্ষণ না সে অন্য ব্যক্তির দ্বারা গর্ভবতী হত, যার সঙ্গে তার যৌন মিলন হত। যখন তার গর্ভ সুস্পষ্টভাবে ইচ্ছে করলে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম করত। এটা ছিল তার স্বামীর অভ্যাস। এতে উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে সে একটি উন্নত জাতের সন্তান লাভ করতে পারে। এ ধরনের বিয়েকে 'নিকাহুল ইস্‌তিবদা' বলা হত।

৩য়: তৃতীয় প্রথা ছিল যে, দশ জনের কম কয়েক ব্যক্তি একত্রিত হয়ে পালাক্রমে একই মহিলার সঙ্গে যৌনমিলনে লিপ্ত হত। যদি মহিলা এর ফলে গর্ভবতী হত এবং সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর কিছুদিন অতিবাহিত হত, সেই মহিলা এ সকল ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাত এবং কেউই আসতে অস্বীকৃতি জানাতে পারত না। যখন সকলেই সেই মহিলার সামনে একত্রিত হত, তখন সে তাদেরকে বলত, তোমরা সকলেই জান- তোমরা কী করেছ! এখন আমি সন্তান প্রসব করেছি, সুতরাং হে অমুক! এটা তোমার সন্তান। ঐ মহিলা যাকে খুশি তার নাম ধরে ডাকত, তখন ঐ ব্যক্তি উক্ত শিশুটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকত এবং ঐ মহিলা তার স্ত্রীরূপে গণ্য হত।

৪র্থ: চতুর্থ প্রকারের বিবাহ হচ্ছে, বহু পুরুষ ঐ মহিলার সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হত এবং ঐ মহিলা তার কাছে যত পুরুষ আসত, কাউকে শয্যা-সঙ্গী করতে অস্বীকার করত না। এরা ছিল পতিতা, যার চিহ্ন হিসেবে নিজ ঘরের সামনে পতাকা উড়িয়ে রাখত। যে কেউ ইচ্ছে করলে অবাধে এদের সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া সকল কাফাহ্ পুরুষ এবং একজন 'কাফাহ্' (এমন একজন বিশেষজ্ঞ, যারা সন্তানের মুখ অথবা শরীরের কোন অঙ্গ দেখে বলতে পারত- অমুকের ঔরসজাত সন্তান)-কে ডেকে আনা হত। সে সন্তানটির যে লোকটির সঙ্গে সাদৃশ্য দেখতে পেত তাকে বলত, এটি তোমার সন্তান। তখন ঐ লোকটি ঐ সন্তানকে নিজের হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হত এবং লোকে ঐ সন্তানকে তার সন্তান হিসেবে আখ্যা দিত এবং সে এই সন্তানকে অস্বীকার করতে পারত না। যখন রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -- কে সত্য দ্বীনসহ পাঠানো হল তখন তিনি বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থা ছাড়া জাহিলী যুগের সমস্ত বিবাহের রীতি বাতিল করে দিলেন।

(আধুনিক প্রকাশনী- অনুচ্ছেদ ৩৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৭৫১)

কন্যা সন্তানের জীবন্ত কবর

আরবে জাহেলিয়্যাতের যুগে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করা ছিল মারাত্মক একটি দোষনীয় ব্যাপার। চরম যিল্লতী ও অপমানের কারণ মনে করা হত একে। জাহেলী যুগে মেয়েদের সাথে কি করুণ নিষ্ঠুর আচরণ করা হত তার ইতিহাস দেখুন। তাফসীরে মাযহারীতে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে- আল্লামা বাগভী র. লিখেছেন, মুযার, খুযা'আ এবং বধূ তামীম গোত্রে মেয়েদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া হত। এর কারণ ছিল দু'টি

ক. দারিদ্রতার ভয়।

খ. অসম গোত্রের নিকট থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসার আশংকা।

আরবে এরূপ গোত্রগুলোর মধ্যে মেয়ে হলে তাদের জীবিত রাখতে চাইলে তাদেরকে ভেড়া-বকরীর পশম দ্বারা তৈরী পোশাক পরিয়ে জঙ্গল আর ময়দানে উট-ছাগল চরানোর দায়িত্ব চাপিয়ে দিত। আর যদি তাদের জীবন্ত না রাখা মনস্থ হত, তাহলে ৫/৬ বৎসর পর্যন্ত এমনিই রেখে দিত। ষষ্ঠ বৎসরে পদার্পন করলে মেয়ের মাকে নির্দেষ দিত, তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে দেবার জন্য নিয়ে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে। পূর্ব থেকেই ময়দানে-জঙ্গলে কুপ খনন করে রাখা হত। সে মেয়ে নিয়ে কূপের কিনারায় গিয়ে বলত কূপের দিকে তাকিয়ে দেখ, আর অমনি পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে তাকে কুপে ফেলে দিয়ে তাতে মাটি চাপা দিয়ে চলে আসত। মাটি ভরে জমিন বরাবর করে দিত। - তাফসীরে মাযহারী, সূরা নাহল: ২৬, ৫/৩৪৮।

নিজ মেয়ে হত্যার এক করুন কাহিনী

একবার এক আরব সরদার হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে এরূপ একটি ঘটনার বিবরণ দিলে হযরতের দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তাঁর মন এরূপ ভারাক্রান্ত হয়েছিল, যার ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই জবান

মুবারক থেকে এ বাক্য নিঃসৃত হল- আল্লাহর কসম এটি বড় পাষাণ হৃদয়ের কাজ। যে দয়া করবে না তার প্রতিও দয়া প্রদর্শন করা হবে না

সে আরব নেতা তার সে ঘটনাটি যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন তা নিম্নরূপ-
আমার ঘরে একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছিল। আমি ছিলাম তখন সফরে। আমার স্ত্রী আমার ভয়ে সে কন্যা শিশুকে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার বোনের কাছে। আমি সফর থেকে ফিরে আসলে সে মিছামিছি আমাকে বলে দিল, বাচ্চাটি মৃত জন্ম হয়েছিল। যা বলার বলল, যা হবার হয়ে গেল। এদিকে সে শিশু লালিত পালিত হচ্ছিল তার খালার নিকটে। আমার অনুপস্থিতিতে একদিন সে শিশুকন্যা তার মায়ের সাথে সাক্ষাতে এল। ঘটণাচক্রে আমিও সেদিন এসে উপস্থিত হলাম। শিশু কন্যাটিকে দেখে আমি বললাম, এটি কার বাচ্চা? যেহেতু আমি তখন শিশুটির প্রতি স্নেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলাম, সেহেতু তার মা মনে করল, রক্তের স্বাভাবিক সম্পর্কের কারণেই আমি প্রভাবিত হয়ে পড়েছি। ফলে তার সাথে আমি নির্মম আচরণ করব না। পক্ষান্তরে আমার অবস্থাটাও তখন অনুরূপ ছিল। আমি তাকে লালন-পালনের অনুমতি দিয়ে দেই। অবশেষে একদিন আমার মাথায় জাহেলিয়্যাতের তথাকথিত আত্মমর্যাদাবোধ এমনিভাবেই চেপে বসে, যার ফলে ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে। ফলে টালবাহানা করে সেই শিশু কন্যাটিকে জঙ্গলে নিয়ে যাই। খুঁড়তে আরম্ভ করি গর্ত। গর্ত খুঁড়বার সময় শিশু কন্যাটি আমার কাপড় জড়িয়ে ধরে নিস্পাপ হাতে। আমি তাকে ছাড়িয়ে দেই কৃত্রিম স্নেহে। গর্তের কাজ সমাপ্ত হলে সে অবলা শিশুটিকে তাতে দাঁড় করাই। মাটি ফেলতে শুরু করি। যখন মাটি ফেলতে আরম্ভ করি, তখন এরূপ হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয় যে, বাচ্চাটি অত্যন্ত স্নেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে থাকে, আর আমাকে সম্বোধন করে বলতে থাকে, আব্বু! তুমি একি করছ? কসম, বল, তুমি কি করতে যাচ্ছ? তুমি কি এরূপ নির্মম আচরণ করে নির্জনে আমাকে ফেলে যাবে? শিশুটির নিস্পাপ আওয়াজ আমার কর্ণকুহরে পড়ে সীমাহীন প্রভাব বিস্তার করেছিল, চোট লাগছিল অন্তরের গহীনে প্রচন্ড ভাবে। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও উম্মাদের ন্যায় আমি আমার কাজ সমাপ্ত করেছি। তাকে মাটির গর্তে চাপা দিয়ে চলে এসেছি আপন নীড়ে। (জাহিলিয়্যাতের কথিত সেই আত্মমর্যাদা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে)। জাহেলী যুগের নির্মম ইতিহাস রয়েছে এরূপ হাজারো। নিম্নে এরূপ আরো কয়েকটি ঘনটার বিবরণ পেশ করা হল-

মেয়ে হত্যার আরেকটি লোমহর্ষক ঘটনা

মুসনাদে দারেমী গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে নিম্নরূপ- জনৈক সাহাবী বর্বরতার যুগের নিজস্ব একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট। সাহাবী বলেন, আমার ছোট্ট একটি শিশু কন্যা ছিল। আমার মধ্যে ছিল বর্বরতার যুগের ভ্রান্ত আত্মমর্যাদাবোধ। সে কথিত আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি আমার আপন সন্তানকে জীবন্ত কবর দিয়েছি। কবর দেয়ার সময় যখন আমি তার উপর মাটি ফেলেছিলাম, তখন সে আমাকে সম্বোধন করে আব্বু আব্বু করে চিৎকার করছিল, আর আমি নিষ্ঠুরতার সাথে সমাধা করেছিলাম আমার কাজ। এ নির্মম কাহিনী শুনে রাহমাতুল লিল্ 'আলামীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুচোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠল। গড়িয়ে পড়তে লাগল অনিচ্ছায় তাঁর চোখের পানি। এ ঘটনায় ভীষণ প্রভাবিত হয়ে হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীকে বললেন, ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি কর। সাহাবী পুনরাবৃত্তি করলেন, আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বে-ইখতিয়ারীভাবে এত অধিক কাঁদলেন যে, তাঁর দাড়ি মুবারক পর্যন্ত সিক্ত হয়ে গিয়েছিল।

মুসুক বয়ান দি পার্সেওয়াল হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং বধূ তামীম গোত্রের নেতা কায়েসের একটি সংলাপের বিবরণ দিয়েছেন। তার সে বিবরণ পাঠে জানা যায়, মেয়েদের সম্পর্কে আরবদের ধারণা কত জঘন্য ছিল। একবার হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি শিশু কন্যাকে হাটুর উপর বসিয়ে খাওয়াচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় বণু তামীম সরদার কায়েসের উপস্থিতি ঘটে। সে এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, এটি কোন জানোয়ারের বাচ্চা, যাকে আপনি খাওয়াচ্ছেন? প্রতি উত্তরে খাতামুন্নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটি আমার সন্তান। কায়েস বলল, মহান আল্লাহর শপথ! এরূপ কন্যা সন্তান আমার অনেক হয়েছিল। তাদের সবাইকে আমি জীবন্ত কবর দিয়েছি। তাদের কাউকে আমি খানা খাওয়াইনি।

জবাবে সাইয়্যিদুল মুরসালীন রহমাতাল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওরে বদবখত দুর্ভাগা! মনে হয় আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তরে কোন প্রকার

মানবিক স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করেননি। তুমি আল্লাহ কর্তৃক মানুষকে প্রদত্ত একটি বিরাট নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। -তামাদ্দুনে আরব: ড. গুস্তাওলিবান।

“আহ! কী করুণ ছিল সে সময়ের কন্যাশিশুদের জীবন। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর নিচে চাপা পড়া জীবন্ত কন্যাশিশুর আর্তনাদ শুনবার মতো কেউ ছিল না। সমাজ কতটা জাহেলিয়াত, বর্বরতা ও মানবতাহীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হলে একটি পিতা নিজ হাতেই নিজের নিষ্পাপ সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতে পারে! কী পরিমাণ জাহেলিয়াতের মাঝে থাকলে মানুষ এতটা নির্মম ও নির্দয় কাজে লিপ্ত হতে পারে! এই ছিল জাহেলিয়াতের যুগে শুভ্র মায়াভরা মেয়েদের ঠুনকো জীবন। এটাই ছিল প্রাক-ইসলামী আরব সমাজে নারীর অবস্থান— অনিরাপদ, অবমূল্যায়িত ও করুণ।“ইসলামের আগমনের মাধ্যমেই এই নির্মম প্রথার অবসান ঘটে এবং জাহেলিয়াতের অন্ধকার যুগের কবর রচিত হয়। এরপর নারী লাভ করে মানবিক মর্যাদা, নিরাপত্তা ও বেঁচে থাকার অধিকার।”

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামে নারীর অধিকার

'নারী অধিকার' বলতে সাধারণত সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর জন্য নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট পাওনা, দাবি বা সুরক্ষাকে বোঝায়। আরবী অভিধানে নারীর জন্য প্রধানত 'নিসা' (نِسَاء) এবং 'আল-মারআহ' (المَرْأَةُ) শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়। আরবী ভাষার গভীর তাৎপর্য অনুযায়ী, 'আল-মারআহ' শব্দটি মূলত 'আল-মুরুআহ' (المُرُوءَةُ) থেকে এসেছে; যার অর্থ হলো মানবতা, আত্মসম্মান এবং নৈতিক শালীনতা। অন্যদিকে 'নিসা' শব্দের অর্থ হলো এমন এক কোমল সত্তা যার প্রতি বিশেষ যত্ন ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদর্শন করা আবশ্যক। অন্যদিকে আরবি ‘হাক্ক’ (حق) শব্দের বহুবচন হলো ‘হুকুক’ (حقوق), যার সাধারণ অর্থ হলো অধিকার, পাওনা, সত্য বা সুনির্দিষ্ট দাবি।

পরিভাষায়, ইসলামে নারীর অধিকার বলতে খোদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত সেই সকল ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনি সুরক্ষাকে বোঝায় যা নারীর মানবীয় বিকাশ ও মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ইসলামে নারীর এই অধিকারগুলো কোনো সামাজিক অনুদান বা পুরুষের দেওয়া দয়া নয়; বরং তা অপরিবর্তনশীল ও সুনির্দিষ্ট এক ঐশ্বরিক বিধান।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ

“অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে কোনো আমলকারীর আমল নষ্ট করব না, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী; তোমরা একে অপরের অংশ।” — (সূরা আল-ইমরান, ৩:১৯৫)

এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, আল্লাহর দরবারে পরকালীন পুরস্কার, আমল এবং আত্মিক মর্যাদার ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক কোনো বৈষম্য নেই। তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ইসলাম নারী ও পুরুষকে ‘সমান’ (Equal) হিসেবে অভিন্ন করে দেয়নি; বরং তাদের অধিকারকে ন্যায়ভিত্তিক (Equitable) ভারসাম্যের মাধ্যমে বণ্টন

করেছে। সৃষ্টিগত ও জৈবিক পার্থক্যের কারণে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভিন্ন হলেও সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে তারা পরস্পরের পরিপূরক।

পাশাপাশি, বর্তমান সময়ে ইসলামে নারীর অধিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে কেবল মুসলিম সমাজের বাস্তব চিত্রকে ইসলাম হিসেবে বিবেচনা করা সঠিক নয়। কারণ বহু মুসলিম সমাজেই ইসলামি নীতিমালার পরিবর্তে স্থানীয় কুপ্রথা, সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রাধান্য পেয়েছে, যার ফলে নারীরা প্রকৃত ইসলাম প্রদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। অতএব, ইসলামে নারীর প্রকৃত অবস্থান বুঝতে হলে সরাসরি ইসলামের মৌলিক উৎস—পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক।

উল্লেখ্য, ইসলামে নারীর জন্য যে বিস্তৃত ও সুসংহত অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা ইতিহাসের কোনো বাদ মতবাদ, দর্শন বা আধুনিক কোনো তন্ত্র-মন্ত্র ও ইতিহাসে সমানভাবে ও পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিফলিত হয়নি। নারীকে মর্যাদা, নিরাপত্তা, সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ এবং সামাজিক স্বীকৃতির যে সর্বাঙ্গীন কাঠামো ইসলাম প্রদান করেছে, তা মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক অনন্য ও বিপ্লবী দৃষ্টান্ত। আধুনিক বহু মতবাদ যেখানে নারীর অধিকারকে ধাপে ধাপে স্বীকৃতি দিয়েছে, সেখানে ইসলাম ১৪০০ বছরেরও আগে এসব অধিকারকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও ঐশ্বরিক বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কুরআন ও সুন্নাহর এই বিশুদ্ধ আলোকেই ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের পরিধি কতখানি বিস্তৃত, তা অনুধাবনের জন্য সমগ্র বিষয়টিকে প্রধানত সাতটি মৌলিক ক্যাটাগরিতে বিন্যস্ত করে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—

1.ইসলামে নারীর আধ্যাত্মিক অধিকার
2.ইসলামে নারীর ইলম অর্জনের অধিকার
3.ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার
4.ইসলামে নারীর পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার
5.ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকার
6.ইসলামে নারীর নিরাপত্তা লাভের অধিকার
7.ইসলামে নারীর আইনানুগ অধিকার

1.ইসলামে নারীর আধ্যাত্মিক অধিকার

ইসলাম নারীকে কেবল সামাজিক বা পারিবারিক পরিচয়ের মাধ্যমে মূল্যায়ন করেনি; বরং তাকে একজন পূর্ণাঙ্গ আত্মিক সত্তা ও আল্লাহর বান্দাহ,বান্দী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহতে নারীর আধ্যাত্মিক অধিকারকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। ঈমান, ইবাদত, জ্ঞান অর্জন, তাকওয়া, তাওবা, জান্নাত লাভ ও নেক আমলের প্রতিদানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে মৌলিক কোনো বৈষম্য নেই। নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ঈমান ও আমলে নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা

ইসলাম ঘোষণা করেছে যে আল্লাহর নিকট মর্যাদার ভিত্তি হলো ঈমান ও নেক আমল; লিঙ্গ নয়। নারী যেমন ঈমান গ্রহণ, ইবাদত ও সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে, তেমনি পুরুষও করতে পারে। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই।পুরুষের ন্যায় একজন নারীকেও কালেমা বিশ্বাসের মাধ্যমে তার ঈমান ও আমলকে সুসংহত করার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ঈমানের আরকান হল সাতটি। তাওহীদে বিশ্বাসের পরেই বাকী ৬টির প্রতি ঈমান আনাও নারীদের সমভাবে প্রযোজ্য। এছাড়া প্রতিটি নারীকে আত্মীয়-স্বজনের সাথে, পাড়া-প্রতিবেশীগণের সাথে, কর্মচারী ছোট বড় সকলের সাথে ভালো আচার ব্যবহারের নির্দেশ দেয় ইসলাম। এভাবে ইসলামের প্রতিটি বিধান পুরুষের ন্যায় নারীকে ও পালন করে দুনিয়া ও আখিরাতে সুন্দর, সুখী, সমৃদ্ধশীল, কল্যাণময়ী জীবন গঠন করার তাগিদ কুরআন-হাদীসে প্রদান করা হয়েছে।

সূরা বাকারায় ১৭৭ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন __ "শুধু পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোর মধ্যে কোন নেকী নেই। প্রকৃতপক্ষে নেকী হল, যে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, আখিরাতের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, আসমানী কিতাবের ওপর এবং নবীদের ওপর।"

সুতরাং ঈমান আনয়নের পরই নারীকে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত বিধান যথাযথভাবে পালন করতে হয়।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন—

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ

অর্থ:"অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের দোয়া কবুল করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের কোনো কর্মীর কর্ম নষ্ট করি না—সে পুরুষ হোক বা নারী; তোমরা একে অপরের অংশ।" (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯৫)
এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে নারী ও পুরুষ উভয়ের নেক আমল আল্লাহর নিকট সমানভাবে মূল্যবান। আরো বলা হয়েছে যে কারো আমল নষ্ট করবেন না
এ ব্যাপারে আরও ইরশাদ হয়েছে—

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

অর্থ:"যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে—পুরুষ হোক বা নারী—এবং সে মুমিন হয়, তবে আমি তাকে অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব।" (সূরা আন-নাহল, ১৬:৯৭)

এই আয়াত দ্বারা নারীর আত্মিক উন্নতি ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নৈকট্য অর্জনের পূর্ণ অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে।
নারী নারীর জন্য, আবার পুরুষ পুরুষের জন্য- এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি তে কেউ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারবে না; আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয় ঈমান ও আমলের মাধ্যমে। ঈমানের পরই ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন তথা আমলের মাধ্যমে নারীও অনেক সময় পুরুষ কে পেছনে ফেলে আল্লাহর নৈকট্য সহজেই অর্জন করতে পারে। এভাবে ঈমান ও বিশ্বাসের দিকে নারী ও পুরুষ কে অধিকার এর দিকে সমান রেখেছেন।

ইবাদত পালনের অধিকার

ইসলাম কোন পুরুষকে এককভাবে ইবাদত বন্দেগী করার জন্য হুকুম করেননি বরং এক্ষেত্রে ইসলাম নারী পুরুষ সবাইকেই ইবাদত পালনের হুকুম করেছেন। সালাত, সাওম, যিকির, দোয়া, তিলাওয়াত, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদত নারীর জন্যও সমানভাবে

প্রযোজ্য। অর্থাৎ ইসলাম ই একমাত্র ধর্ম যেখানে নারীকে স্বাধীনভাবে আল্লাহর ইবাদত করার অধিকার দিয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন— وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
অর্থ:"আমি জিন ও মানুষকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬)
এখানে "মানুষ" শব্দের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।তাই বলা যায় ইবাদতের ক্ষেত্রে উভয়ের সমান অধিকার রয়েছে।

এক্ষেত্রে সূরা আল-আহজাব ৩৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাল্লাহু ওয়া তাআলা১০টি আধ্যাত্মিক গুণের কথা উল্লেখ করেছেন, এবং যেখানে নারী ও পুরুষকে সমানভাবে সম্বোধন করে বলেছেন __

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থ:"নিশ্চয়ই আনুগত্য প্রকাশকারী পুরুষ ও আনুগত্য প্রকাশকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, ইবাদতগোজার পুরুষ ও ইবাদতগোজার নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, আন্তরিকভাবে বিনীত পুরুষ ও আন্তরিকভাবে বিনীত নারী, সদকাকারী পুরুষ ও সদকাকারী নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও হেফাজতকারী নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী আল্লাহ এদের সকলের জন্য মাগফেরাত ও মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।"

এই আয়াতে নারী-পুরুষ উভয়ের ইবাদত, ধৈর্য, যিকির ও আত্মশুদ্ধিকে সমানভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

জ্ঞান অর্জনের আধ্যাত্মিক অধিকার

ইসলামে জ্ঞান অর্জন নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য অপরিহার্য। দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নারী আত্মিক উন্নতি ও আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন— طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।" — সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২২৪
এখানে "প্রত্যেক মুসলিম" শব্দটি দ্বারা নারী-পুরুষ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

নারীরা রাসূল ﷺ-এর নিকট আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থার আবেদন করলে তিনি তাদের জন্য নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করেন। (সহিহ বুখারী, হাদিস: ১০১)
এটি প্রমাণ করে যে ইসলাম নারীর দ্বীনি শিক্ষা ও আত্মিক জাগরণের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

তাকওয়ার ভিত্তিতে মর্যাদা লাভের অধিকার

ইসলাম বংশ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থানকে মর্যাদার মানদণ্ড বানায়নি; বরং তাকওয়াকে প্রকৃত মর্যাদার ভিত্তি ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন— إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
অর্থ:"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত, যে অধিক তাকওয়াবান।" — সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১৩
এ আয়াত নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদাকে পুরুষের সমপর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করে।

হাদীসেও নারীর তাকওয়ার মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে তাকান না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে তাকান।" — সহীহ মুসলিম
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন— هَاهُنَا التَّقْوَى "তাকওয়া এখানে।"

এ কথা বলে তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৬৪)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, তাকওয়া নারী-পুরুষ উভয়ের অন্তরের গুণ; আল্লাহর কাছে মর্যাদার মূল মাপকাঠি হলো এই তাকওয়া।

তাওবা ও আত্মশুদ্ধির অধিকার

নারীও পুরুষের মতো তাওবা করে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জন করতে পারে। ইসলাম নারীর জন্য আত্মশুদ্ধি ও পাপমুক্ত জীবনের পথ উন্মুক্ত রেখেছে।

আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়া তায়ালা বলেন—

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।"

— সূরা আন-নূর, ২৪:৩১

এই নির্দেশ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

নেক আমলের প্রতিদান লাভের অধিকার

ইসলাম ঘোষণা করেছে যে নারীও পুরুষের মতো পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে। নারী নেক কাজ করবে আর তা বিফলে যাবে এটা কখনোই হতে পারে না। বরং ইসলামে যে নেক কাজ করবে তাকেই উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে।

পরকালীন সাফল্যের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

অর্থ: "আর মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যারা সৎকর্ম করে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি তিল পরিমাণও জুলুম করা হবে না।"

— সূরা আন-নিসা, ৪:১২৪

এই আয়াত দ্বারা নারীর আখিরাতমুখী আত্মিক অধিকারকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

আল্লাহর যিকির ও আত্মিক প্রশান্তির অধিকার

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয় কেই আল্লাহর যিকির, দোয়া ও ইবাদতের মাধ্যমে আত্মিক প্রশান্তি অর্জনের সুযোগ দিয়েছে।
আল্লাহ তায়ালা বলেন— أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"জেনে রাখো, আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।"(সূরা আর-রা'দ, ১৩:২৮)

নারীও এই আত্মিক প্রশান্তি লাভের পূর্ণ অধিকার রাখে। নারীদের ক্ষেত্রে আল্লাহর যিকির ও আত্মিক প্রশান্তির অধিকার সম্পর্কে হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

"سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ"

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, "মুফাররিদুন কারা?" তিনি বললেন—

"الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ"

"যেসব পুরুষ অধিক আল্লাহর যিকির করে এবং যেসব নারী অধিক আল্লাহর যিকির করে।" (সহীহ মুসলিম : ২৬৭৬)
আরেক হাদীসে এসেছে—

"مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ"

"যে ব্যক্তি তার রবের যিকির করে এবং যে যিকির করে না তাদের উদাহরণ জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়।"(সহীহ আল-বুখারী : ৬৪০৭)

এই হাদীসের শিক্ষা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ আল্লাহর যিকির মানুষের হৃদয়কে জীবন্ত, প্রশান্ত ও আলোকিত করে।

ইসলাম নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদাকে অত্যন্ত উচ্চ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ঈমান, ইবাদত, জ্ঞান অর্জন, তাকওয়া, তাওবা ও আখিরাতের প্রতিদানের ক্ষেত্রে নারীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ ও আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদিসে নারীকে আত্মিক উৎকর্ষ অর্জনের সমান সুযোগ প্রদান করা হয়েছে, যা জাহেলি যুগের বৈষম্যমূলক ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করেছে।

2.ইসলামে ইলম অর্জনে নারীদের অধিকার

ইসলামে জ্ঞান অর্জন নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ও দায়িত্ব। ইসলাম নারীদেরকে ইলম অর্জন থেকে বিরত রাখেনি; বরং দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জনকে তাদের জন্য অপরিহার্য করেছে। কুরআন ও হাদিসে জ্ঞানীদের মর্যাদা বর্ণনা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং রাসূল ﷺ স্পষ্টভাবে ইলম শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। একজন নারী তার আকিদা, ইবাদত, পারিবারিক জীবন, সামাজিক দায়িত্ব এবং আত্মশুদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের পূর্ণ অধিকার রাখে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াতসমূহে বলেন—

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

“পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিণ্ড থেকে। পড়, আর তোমার প্রতিপালক মহা সম্মানিত। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।” (সূরা আল-আলাক : ১-৫)

আল-কুরআনের প্রথম নির্দেশনা ছিল “পড়”। নামায, রোযা বা যাকাতের নির্দেশের আগেই ইসলাম জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। এ নির্দেশনা মানবজাতির জন্য যেমন, তেমনি নারীদের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে আরও বলেন—

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

“বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না—তারা কি সমান হতে পারে? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।” (সূরা আয-যুমার : ৯)

এই আয়াতে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি; বরং জ্ঞানী ও অজ্ঞ ব্যক্তির মর্যাদাগত পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, ইসলামে ইলম অর্জনের মর্যাদা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে আরো বলেন— وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا
"আর বলুন, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।" (সূরা ত্ব-হা : ১১৪)
এই আয়াত জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করার শিক্ষা দেওয়া হয়, যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। এছাড়া ইসলামে প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরজে আইন পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করা ফরজ করেছেন ।

এ ব্যাপারে হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন— طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
"ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।"
(সুনান ইবন মাজাহ, হাদিস : ২২৪)

অনেক মুহাদ্দিস ও আলেম ব্যাখ্যা করেছেন যে, এখানে "মুসলিম" শব্দের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ একজন মুসলিম নারীও প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের দায়িত্ব বহন করে। এই হাদিসের আলোকে বলা যায়, একজন মুসলিম নর-নারীর জন্য দ্বীনের প্রয়োজনীয় ফরজ পরিমাণ ইলম অর্জন করা আবশ্যক। কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এ প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন থেকে বিরত থাকে, তবে সে গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ সঠিক ইবাদত, হালাল-হারাম, আকিদা ও দৈনন্দিন ইসলামী বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ছাড়া একজন মুসলমানের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে দ্বীন পালন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া তলবে ইলমের যত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে তা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই।
হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ

"যে ব্যক্তির অধীনে কোনো দাসী ছিল, সে তাকে শিক্ষা দিলো এবং উত্তমভাবে শিক্ষা দিলো, তাকে শিষ্টাচার ও আদব শিক্ষা দিলো এবং উত্তমভাবে আদব শিখালো, এরপর

তাকে মুক্ত করে বিয়ে করলো—তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।" (সহিহ আল-বুখারি)
এই হাদীছে স্বয়ং পুরুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যেন তারা তাদের অধীনস্তদের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করে, আর এর বিনময়রূপে জান্নাতের ঘোষণা এসেছে।

এছাড়া নবী মুহাম্মদ ﷺ পিতা-মাতাকে কন্যা সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। একজন নারীর বিয়ের পর তার স্বামীর দায়িত্ব হলো তাকে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করা। যদি স্বামী নিজে শিক্ষা দিতে সক্ষম না হন, তবে স্ত্রী জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে তাকে শিক্ষালাভের সুযোগ করে দিতে হবে। একইভাবে পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো মেয়েদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
সহিহ বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী নারী সাহাবীগণ জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তারা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলেন যে, পুরুষরা অধিকাংশ সময় তাঁর নিকট উপস্থিত থাকে; তাই তাদের জন্য যেন আলাদা একটি দিন নির্ধারণ করা হয়। তখন রাসূল ﷺ তাদের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষার দিন নির্ধারণ করেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস : ১০১)

এ হাদীছ সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করে যে, ইলম অর্জনের জন্য নবীর কাছে যেমন নারীদের আলাদা সময় পাওয়ার হক ছিলো তেমনি কিয়ামত পর্যন্ত নবীর ওয়ারিশদের কাছেও সেটা পাওয়া তাদের হক। এ ঘটনা নারীদের শিক্ষার অধিকারকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, প্রায় চৌদ্দশ বছর পূর্বে যখন পৃথিবীর বহু সমাজে নারীদের অবজ্ঞা করা হতো, তাদেরকে সম্পত্তির মতো বিবেচনা করা হতো এবং শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হতো, তখন ইসলাম নারীদের শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। এটি ইসলামের একটি বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি। নারী সাহাবীদের জীবনেও এর বাস্তব অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। বিশেষভাবে আয়িশা (রা.) ছিলেন ইসলামের অন্যতম প্রধান জ্ঞানবাহক। বহু সাহাবি তাঁর কাছ থেকে হাদিস, ফিকহ ও দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তিনি শুধু নারীদের নয়, বরং পুরুষ সাহাবিদেরও দিকনির্দেশনা দিতেন।

তাঁর ভাগিনা উরওয়া ইবন যুবাইর বলেন— "আমি কুরআন, ফিকহ, হালাল-হারাম, আরবি ভাষা, ইতিহাস ও কবিতার জ্ঞানে আয়িশা (রা.)-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী কাউকে দেখিনি।"

এটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম নারীদের শুধু জ্ঞান অর্জনের অনুমতি দেয়নি; বরং জ্ঞান প্রচার ও শিক্ষাদানের মর্যাদাপূর্ণ স্থানেও অধিষ্ঠিত করেছে।

হযরত আয়েশা (রা) শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই দক্ষ ছিলেন না চিকিৎসা বিষয়েও তার ছিল অগাধ জ্ঞান। যখনই কোনো বিদেশী প্রতিনিধি রাসূল (স)-এর সান্নিধ্যে আসতেন এবং আলোচনা করতেন, তিনি তাদের গবেষণাধর্মী আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তা মনে রাখতেন। গণিতশাস্ত্রেও তাঁর ভালো দখল ছিল, অনেক সময় সাহাবিগণও মিরাস অর্থাৎ উত্তরাধিকার বিষয়ে তাঁর নিকট সমাধান নিতে আসতেন। মিরাস কত অংশে বিভক্ত হবে, প্রত্যেকে কত অংশ পাবে এ সম্পর্কে তিনি অগাধ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি এসব বিষয়ে এতোটাই পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন যে অনেক সময় তিনি আবু হুরাইরা (রা)-কেও দিকনির্দেশনা দিতেন। নিয়মিত অধ্যয়ন ও চর্চার মাধ্যমে তিনি স্বয়ং ২২১০ টি হাদীস বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন।

উম্মে আবি মুসার মতে তিনি [আয়েশা (রা)] একজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ ছিলেন। তিনি বলেছেন, যখনই আমাদের সাহাবীদের কোনো বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন হতো আমরা তখন হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট যেতাম এবং অবশ্যই তাঁর নিকট এ বিষয়ের জ্ঞান ছিল। তিনি ৮৮ জনের অধিক পণ্ডিতকে শিক্ষা দিয়েছেন। সংক্ষেপে বললে তিনি ছিলেন পণ্ডিতদের পণ্ডিত।

এছাড়া অন্যান্য নারী সাহাবীদের জীবনেও জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষাদানের অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে ফাতিমা বিনতে কায়েস অন্যতম। তিনি হাদিস ও দ্বীনি জ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। এছাড়াও সাফিয়্যা বিনতে হুয়াইয়্য (রা.), যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী ছিলেন, ইসলামী ফিকহে বিশেষ জ্ঞান রাখতেন। ইমাম নববী (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, "তিনি তাঁর যুগের নারীদের মধ্যে অন্যতম বুদ্ধিমতী ছিলেন।"

একইভাবে উম্মে সালামা (রা.) ছিলেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ফিকহশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী। ইবনে হাজার (রহ.) উল্লেখ করেন যে, বহু আলেম তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি এমন গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে, গুরুত্বপূর্ণ ফিকহি আলোচনায় তাঁর মতামত অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হতো। ইমাম নববী (রহ.)-এর মতে, তিনি ইসলামের প্রথম যুগে ঈমান গ্রহণকারী এবং গভীর জ্ঞানসম্পন্ন নারীদের অন্যতম ছিলেন।

আরেক অনন্য দৃষ্টান্ত উম্মে সুলাইম (রা.), যিনি আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর মাতা। তিনি দাওয়াহ ও দ্বীনি শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। একইভাবে সাইয়্যেদা নাফিসা, যিনি হাসান ইবন আলী (রা.)-এর বংশধর ছিলেন, তিনি জ্ঞান ও তাকওয়ার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইমাম শাফেয়ী তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছেন।

এছাড়াও উম্মে দারদা (রা.) ছিলেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় অনন্য এক নারী। তিনি ফিকহ ও হাদিসশাস্ত্রে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.)-সহ বহু আলেম তাঁর জ্ঞানগভীরতার প্রশংসা করেছেন। জ্ঞানচর্চা ও তলবে ইলমের ক্ষেত্রে আরো বহু স্ত্রী সাহাবীর নাম এখানে উল্লেখ করা যায়।

যেসকল সাহাবিয়্যাহ রা কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আরওয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, হযরত খানসা, সু'দা বিনতে কোরায়য (হযরত উছমান রা.-এর খালা), নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধবোন শায়মা, আতেকা বিনতে যায়দ ও অন্যান্য। বর্ণিত আছে যে, হযরত খানসা (রা.)-এর কবিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শ্রবণ করতেন, আর হাতে ইশারা করে বলতেন, হে খানসা, আরো কিছু শোনাও। (ইলইসাবা, ইবনে হাজার ৪/২৪৮৬-২৪৮৭) নারীসমাজের ইলমচর্চার এ ধারা পরবর্তী যুগেও অব্যাহত ছিলো। ইবনে আসাকির বলেন, ইমাম বুখারী যেসকল নারী মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ তাঁর নারীশায়খ-এর সংখ্যা ছিলো আশির উপরে। ইমাম যাহাবী রহ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে যেখানে বহু পুরুষ বর্ণনাকারী মিথ্যাচারী বলে অভিযুক্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন দোষ-দুর্বলতার কারণে পরিত্যক্ত বলে সাব্যস্ত হয়েছেন সেখানে কোন নারীবর্ণনাকারী অভিযুক্ত বা পরিত্যক্ত সব্যস্ত হননি।

হানাফী ফিকহ-এর সুপসিদ্ধ কিতাব 'বাদায়েউস সানায়ে'-এর রচয়িতা আল্লামা কাসানী রহ, এর স্ত্রী হলেন ফাতেমা। তিনি এত উচ্চস্তরের ফকীহা ছিলেন যে, তিনি, তাঁর পিতা

আল্লামা সমরকন্দী ও স্বামী আল্লামা কাসানী, এই তিনজনের সম্মিলিত স্বাক্ষরে ফতোয়া জারি করা হতো। ফাতিমা আল-ফিহরি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। জয়নাব বিনতে আল-কামাল হাদিসশাস্ত্রে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং বহু বড় মুহাদ্দিস তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। একইভাবে কারিমা আল-মারওয়াজিয়া সহিহ বুখারীর গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনাকারীদের একজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এমনকি হিন্দুস্তানের ইতিহাসেও এর নমুনা রয়েছে। ভুপালের প্রসিদ্ধ আলিম মুফতি মাওলানা আব্দুল কাইউম (রহ.)-এর স্ত্রী ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লহ দেহলবী (রহ.)-এর খান্দানের নারী। তিনি এত বড় আলিমা ছিলেন যে, কোন কঠিন মাসআলার সম্মুখীন হলে মুফতী আব্দুল কাইউম (রহ.) বলতেন অপেক্ষা করো, আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে বলছি।

সুতরাং উপরে উল্লেখিত আলোচনা থেকে বলা ইসলামের ইতিহাসে নারী শুধু জ্ঞান অর্জনই করেননি; বরং শিক্ষা, গবেষণা ও জ্ঞান বিতরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। পরবর্তী যুগেও বহু মুসলিম নারী হাদিস, ফিকহ ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞানে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। এই ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে যে, ইসলামে নারীদের জ্ঞানচর্চা কোনো ব্যতিক্রম ছিল না; বরং এটি একটি সুদৃঢ় ঐতিহ্য, যা সাহাবি যুগ থেকে পরবর্তী যুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

উল্লেখ্য, যে যুগে নারীদের প্রতি অবিচার করা হতো, কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো এবং নারীদেরকে সমাজে অবমূল্যায়ন করা হতো, সেই অন্ধকার যুগেই ইসলাম নারীদের জ্ঞান অর্জনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। শুধু অধিকারই নয়, বরং চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ফিকহ, হাদিস, সাহিত্য ও দাওয়াহসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম নারীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ইসলাম ঘোষণা করেছে যে, প্রত্যেক নারী শিক্ষিত হওয়ার অধিকার রাখে।

অতএব, কুরআন, হাদিস এবং নারী সাহাবীদের জীবনী থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে নারী শিক্ষা কেবল অনুমোদিতই নয়; বরং তা উৎসাহিত ও মর্যাদাপূর্ণ একটি বিষয়।

3.ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

ইসলাম নারীকে শুধু পারিবারিক মর্যাদা ও সামাজিক সম্মানই প্রদান করেনি; বরং তাকে একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক সত্তা হিসেবেও স্বীকৃতি দিয়েছে। ইসলাম-পূর্ব জাহেলি সমাজে নারীরা সম্পদ, উত্তরাধিকার ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদেরকে নিজস্ব সম্পদের মালিক মনে করা হতো না; বরং অনেক ক্ষেত্রে নারীকেই সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো। ইসলাম এই অমানবিক প্রথার অবসান ঘটিয়ে নারীকে সম্পদের মালিকানা, উত্তরাধিকার, মাহর, উপার্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভরণ-পোষণের অধিকার প্রদান করেছে। কোরআন ও হাদিসে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যা নারীর আর্থিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করে।

সম্পদের মালিকানার অধিকার

ইসলাম নারীকে নিজ নামে সম্পদ অর্জন, ভোগ, সংরক্ষণ ও ব্যয় করার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। নারীর উপার্জিত সম্পদের উপর স্বামী, পিতা কিংবা অন্য কারও জোরপূর্বক অধিকার নেই। সে স্বাধীনভাবে তার সম্পদ ব্যবহার করতে পারে।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

“আল্লাহ তোমাদের একজনকে অপরজনের উপর যে বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন, তা কামনা করো না। পুরুষের জন্য রয়েছে তার উপার্জিত সম্পদের অংশ এবং নারীর জন্য রয়েছে তার উপার্জিত সম্পদের অংশ।”— সূরা আন-নিসা : ৩২

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।”— সূরা আন-নিসা : ২৯

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“কোনো মুসলিমের সম্পদ তার সন্তুষ্টি ব্যতীত বৈধ নয়।” — মুসনাদ আহমদ

এই আয়াত ও হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে ইসলাম নারীর ব্যক্তিগত সম্পদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছে।

উত্তরাধিকারের অধিকার

ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকারের নির্ধারিত অংশ প্রদান করেছে, যা জাহেলি যুগে ছিল এক বৈপ্লবিক ঘোষণা। ইসলাম-পূর্ব আরবে নারীরা সাধারণত উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। ইসলাম এই অবিচার দূর করে নারীর জন্য নির্ধারিত অংশ বাধ্যতামূলক করে দেয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদে পুরুষের জন্য অংশ রয়েছে এবং নারীর জন্যও অংশ রয়েছে—তা অল্প হোক বা বেশি; এটি নির্ধারিত অংশ।”— সূরা আন-নিসা : ৭

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন—

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

“আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দেন—একজন পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান।”— সূরা আন-নিসা : ১১

আরও বলেন—

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ

“তোমাদের সন্তান না থাকলে স্ত্রীদের জন্য তোমাদের সম্পদের এক-চতুর্থাংশ রয়েছে।”_ সূরা আন-নিসা : ১২
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন__

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

“প্রাপ্য উত্তরাধিকার তার অধিকারীদের মাঝে বণ্টন করো।”— সহিহ বুখারি

এসব আয়াত ও হাদিস প্রমাণ করে যে নারীর উত্তরাধিকার ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ নির্ধারিত অধিকার, যা অস্বীকার করা অন্যায় ও গুনাহ।

দেনমোহর (মাহর) পাওয়ার অধিকার

নারীর সম্মান ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অমোঘ অধিকার দেনমোহর হলো ইসলামী বিবাহ চুক্তির অন্যতম প্রধান ও অবিচ্ছেদ্য শর্ত, যা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেওয়া একটি বাধ্যতামূলক আর্থিক সম্মাননা। পবিত্র কুরআনে একে 'নিহলাহ' বা সন্তুষ্টচিত্তে প্রদত্ত উপহার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি কোনো যৌতুক বা বিয়ের যৌক্তিক মূল্য (Price) নয়, বরং এটি স্ত্রীর একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি। এই অর্থের ওপর পিতা, ভাই বা স্বামীর কোনো অধিকার নেই; স্ত্রী যেভাবে ইচ্ছা এই অর্থ ব্যয়, সঞ্চয় বা বিনিয়োগ করতে পারেন। মূলত, দেনমোহর নারীর বিবাহিত জীবনে এবং ভবিষ্যতে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে (যেমন বিবাহবিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যু) একটি বড় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বলয় হিসেবে কাজ করে।ইসলামে বিবাহের সময় নারীর জন্য 'মাহর' বা দেনমোহর নির্ধারণ ও আদায় করা বাধ্যতামূলক। এটি কেবল একটি সামাজিক প্রথা নয়, বরং নারীর সম্মান, মর্যাদা ও আর্থিক স্বনির্ভরতার প্রতীক।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়ে বলেন—

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহরানা খুশি মনে দিয়ে দাও। অতঃপর তারা যদি স্বেচ্ছায় তার কিছু অংশ তোমাদের ছেড়ে দেয়, তবে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে স্বাগ্রহে ভোগ করো।" [সূরা আন-নিসা: ৪]

ইসলাম নারীর এই অর্থনৈতিক অধিকারকে এতটাই সুরক্ষিত করেছে যে, বিবাহবিচ্ছেদের মতো কঠিন পরিস্থিতিতেও এই সম্পত্তিতে হাত দেওয়ার অধিকার স্বামীকে দেওয়া হয়নি। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন_

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

"তুমি একটি লোহার আংটি হলেও মোহরানা হিসেবে অনুসন্ধান করো।"(সহীহ বুখারী)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন—

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

“তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও এবং তাকে প্রচুর সম্পদও দিয়ে থাকো, তবুও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিও না।”— সূরা আন-নিসা : ২০

পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে_

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"তোমরা তাদের থেকে যে আনন্দ লাভ করেছ, তার বিনিময়ে তাদের নির্ধারিত মোহরানা তাদেরকে দিয়ে দাও ফরজ হিসেবে।"(সূরা আন-নিসা, আয়াত ২৪)

একই সাথে ইসলাম বিয়েকে সহজ করার তাগিদ দিয়েছে, যাতে সমাজে দেনমোহরের নামে কোনো জটিলতা তৈরি না হয়। দেনমোহর ধার্য করার ক্ষেত্রে সামাজিক লোকদেখানো আড়ম্বর পরিহার করে সামর্থ্যের দিকে নজর রাখার নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً

“সর্বাধিক বরকতময় বিবাহ হলো তা, যে বিবাহে ব্যয় বা খরচ কম হয়।”— [মুসনাদ আহমাদ]

তবে বিয়ে সহজ করার অর্থ এই নয় যে দেনমোহর ফাঁকি দেওয়া যাবে। ইসলামে মাহর আদায় করা নামাজ, রোজা বা যাকাতের মতোই একটি অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। এই অধিকার আদায়ে অবহেলা করার বা ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। দেনমোহর পরিশোধ না করার মানসিকতাকে ইসলামে অত্যন্ত ভয়াবহ পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন—

،أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ، لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ

"যে ব্যক্তি কোনো নারীকে কম বা বেশি মোহরানা ধার্য করে বিয়ে করল, অথচ তার অন্তরে সেই মোহরানা (তার প্রাপ্য অধিকার) পরিশোধ করার কোনো ইচ্ছা নেই—সে মূলত তাকে প্রতারিত করল। সে যদি এই অবস্থায় পরিশোধ না করে মারা যায়, তবে কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে ব্যভিচারী হিসেবে উপস্থিত হবে।"— [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৮৮৭]

সুতরাং বলা যায় দেনমোহর নারীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার।

ভরণ-পোষণের অধিকার

ইসলাম নারীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও প্রয়োজনীয় ব্যয়ের দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পণ করেছে। স্ত্রী ধনী হলেও তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব একমাত্র স্বামীর উপরই বর্তায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"পুরুষরা নারীদের অভিভাবক; কারণ তারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে।" — সূরা আন-নিসা : ৩৪।

তিনি আরও বলেন—

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"সন্তানের পিতার উপর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মায়েদের খাদ্য ও বস্ত্রের দায়িত্ব রয়েছে।" — সূরা আল-বাকারাহ : ২৩৩

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন—

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

"সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয় করবে।"— সূরা আত-তালাক : ৭

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ

"তুমি যখন খাবে তখন স্ত্রীকেও খাওয়াবে এবং তুমি যখন পোশাক পরবে তখন তাকেও পোশাক পরাবে।"— সুনান আবু দাউদ : ২১৪২

এসব নির্দেশনা থেকে বোঝা যায়, ইসলাম নারীর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বামীকে দায়িত্বশীল করেছে।

তালাক ও তালাক-পরবর্তী অর্থনৈতিক অধিকার

তালাক দেওয়ার পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (ইদ্দতকালীন সময়, যা সাধারণত তিন মাস) স্ত্রীর ভরণপোষণ করার পূর্ণ দায়িত্ব স্বামীর। এই সময়ে স্ত্রীর বাসস্থান, খাবার ও কাপড়ের খরচ স্বামীকে বহন করতে হয়। আর স্ত্রী যদি গর্ভবতী হন, তবে তার অধিকার আরও বেড়ে যায়। গর্ভে থাকা সন্তানের সুরক্ষায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর যাবতীয় অতিরিক্ত চিকিৎসা ও ভরণপোষণের সম্পূর্ণ খরচ বহন করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন__

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

"তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে নিজে বসবাস করো, তাদেরকেও (তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের) সেখানেই বসবাসের ব্যবস্থা করো এবং তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য কষ্ট দিও না। আর তারা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে।" [সূরা আত-তালাক: ৬]

তাছাড়া বিবাহবিচ্ছেদের পর যদি ছোট সন্তান মায়ের কাছে থাকে এবং মা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ান, তবে ইসলাম এই শ্রমকে অবমূল্যায়ন করেনি। নিজের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও মাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য পিতা আলাদাভাবে পারিশ্রমিক বা অর্থ দিতে বাধ্য থাকে। এর মাধ্যমে তালাকপ্রাপ্তা মায়ের একটি বড় অর্থনৈতিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে__

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ

"যদি তারা তোমাদের সন্তানদের স্তন্যদান করে, তবে তাদের পারিশ্রমিক দাও এবং (সন্তানের কল্যাণের বিষয়ে) তোমরা নিজেদের মধ্যে সদ্ভাবের সাথে পরামর্শ করো।" [সূরা আত-তালাক: ৬]

তালাক হয়ে যাওয়ার মানে এই নয় যে স্বামী স্ত্রীর পূর্বের পাওনা আত্মসাৎ করবে। বিয়ের সময় নির্ধারিত দেনমোহরের কোনো অংশ যদি বাকি থাকে, তবে তালাক দেওয়ার পর তা সুনির্দিষ্টভাবে পরিশোধ করতে হবে। এমনকি বৈবাহিক জীবনে স্ত্রীকে

দেওয়া কোনো উপহার বা সম্পদও স্বামী জোর করে বা কোনো অজুহাতে ফেরত নিতে পারবে না। এমন কাজকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছে।
তালাক বা বিবাহবিচ্ছেদ একটি নারীর জীবনের চরম মানসিক ও সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনে। এই কঠিন সময়ে নারীর আর্থিক ধাক্কা সামলানোর জন্য এবং তার মনকে সান্ত্বনা দিতে ইসলাম স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছে যেন সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী শিশুকে বা স্ত্রীকে এককালীন কিছু সম্পদ, পোশাক বা অর্থ উপহার দেয়। এটি কোনো দয়া নয়, বরং মুত্তাকী বা আল্লাহভীরু স্বামীদের ওপর ইসলামের একটি বিশেষ অর্থনৈতিক দায়িত্ব। যেমন: মহান আল্লাহ বলেন_

وَلِلمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য থাকবে বিধিমাতিলভ্য ভরণপোষণ (বা এককালীন উপহার); এটি মুত্তাকীদের (আল্লাহভীরুদের) ওপর একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৪১]

উপার্জন ও ব্যবসা করার অধিকার

ইসলাম নারীকে বৈধ উপায়ে উপার্জন ও ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছে। নবী ﷺ-এর সম্মানিত স্ত্রী ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী নারী। এটি প্রমাণ করে যে ইসলাম নারীর বৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে।হাদিস অনুযায়ী, নারীরা পর্দার বিধান মেনে ব্যবসা বা যেকোনো হালাল কর্মসংস্থান করতে পারেন।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

"পুরুষ যা উপার্জন করে তার অংশ সে পাবে এবং নারী যা উপার্জন করে তার অংশ সে পাবে।"
— সূরা আন-নিসা : ৩২
অন্যত্র বলেন—

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।" — সূরা আল-বাকারাহ : ২৭৫
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সঙ্গে থাকবে।”— সুনান তিরমিজি

এ থেকে বোঝা যায়, ইসলাম নারীর বৈধ উপার্জনকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সততা ও নৈতিকতার সাথে ব্যবসা করতে উৎসাহিত করেছে।

দান-সদকা করার অধিকার

ইসলাম নারীকে নিজ সম্পদ থেকে দান-সদকা করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। সে নিজের সম্পদ থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে পারে এবং এর সওয়াব লাভ করবে।ইসলাম নারীকে কেবল সম্পদ রাখার অধিকারই দেয়নি, বরং তার নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পদ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জনকল্যাণে ও দান-সদকায় ব্যয় করার পরম এখতিয়ার দিয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ

“নিশ্চয় দানকারী পুরুষ ও দানকারী নারী যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করে, তাদের জন্য বহুগুণ প্রতিদান রয়েছে।”— সূরা আল-হাদিদ : ১৮

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।” — সূরা আল-বাকারাহ : ২৭৩

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا

“নারী যদি স্বামীর ঘর থেকে অপচয় ছাড়া ব্যয় করে, তবে সে এর সওয়াব পাবে।” — সহিহ বুখারি : ১৪৩৭

এটি প্রমাণ করে যে ইসলাম নারীকে দান ও কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণের অধিকার দিয়েছে।

নারীর সম্পদ জোরপূর্বক গ্রহণ নিষিদ্ধ

ইসলাম নারীর সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা কিংবা জোরপূর্বক তার সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

"হে মুমিনগণ! জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়।"— সূরা আন-নিসা : ১৯

অন্যত্র বলেন—

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

"তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।"— সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৮

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান একে অপরের জন্য হারাম।"— সহিহ বুখারি

এসব নির্দেশনা নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক অধিকারকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রতিষ্ঠা করেছে। নারী নিজ সম্পদের মালিক হতে পারে, উপার্জন ও ব্যবসা করতে পারে, উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে, মাহরের অধিকারী হয় এবং ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকার রাখে। কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে ইসলাম নারীর আর্থিক নিরাপত্তা, সম্মান ও স্বাধীনতাকে পূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করেছে।জাহেলি যুগে যেখানে নারী ছিল অবহেলিত ও বঞ্চিত, সেখানে ইসলাম তাকে সম্মানিত করে একটি স্বাধীন অর্থনৈতিক মর্যাদা প্রদান করেছে। কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে ইসলাম নারীর আর্থিক নিরাপত্তা, মর্যাদা ও স্বাধীনতাকে পূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

4.ইসলামে নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অধিকার

- **ইসলামে মা হিসেবে নারীর অধিকার**

ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি সম্পর্ককে সুশৃঙ্খল ও মর্যাদাপূর্ণ করার জন্য সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। পরিবার সমাজের মূল ভিত্তি, আর পরিবারের প্রাণকেন্দ্র হলেন মা। একজন নারীকে মা হতে গিয়ে যে অবর্ণনীয় কষ্ট, অসাধারণ ধৈর্য, অপরিমেয় ত্যাগ ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়, সেই বিবেচনায় ইসলাম মায়ের জন্য বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান নির্ধারণ করেছে। একজন নারী যখন মা হন, তখন তাকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন, তার সাথে উত্তম আচরণ, তাকে কোনো প্রকার কষ্ট না দেওয়া, তার সেবায় আত্মনিয়োগ করা এবং তার কল্যাণের জন্য দোয়া করার নির্দেশ প্রদান করেছে ইসলাম। মা সন্তানের জীবনের প্রথম শিক্ষক, প্রথম অভিভাবক এবং সর্বাধিক ত্যাগ স্বীকারকারী ব্যক্তি। সন্তানের জন্মের পূর্ব থেকে শুরু করে তার বেড়ে ওঠার প্রতিটি ধাপে মায়ের অবদান অনস্বীকার্য। এ কারণেই কোরআনুল কারিমে বহু স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পিতা-মাতার অধিকার, বিশেষ করে মায়ের কষ্ট ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও অসংখ্য হাদিসে মায়ের সম্মান, তার সেবা ও আনুগত্যের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন।

একজন নারীকে মা হতে গিয়ে যে অবর্ণনীয় কষ্ট, অসাধারণ ধৈর্য্য, অপরিমেয় কষ্ট আর ত্যাগের কুরবানি করতে হয় সে বিচারে মায়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান। একজন নারী যখন মা হন, তখন তাকে বিশেষ সম্মান ও অধিক মর্যাদা দেয়ার নির্দেশ দেয় ইসলাম। তার সঙ্গে সর্বোত্তম আচরণ করা, তাকে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়া, তার সেবায় সর্বদা সচেষ্ট হওয়া এবং তার কল্যাণের জন্য আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ করার শিক্ষা দেয় ইসলাম। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা ইরশাদ করেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি উত্তম আচরণের নির্দেশ প্রদান করেছি। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে অতি কষ্টে এবং তাকে প্রসবও করেছে অতি কষ্টে। তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দান করুন, আপনি আমার উপর ও আমার মাতা-পিতার উপর যে নিয়ামত দান করেছেন, আপনার সে নিআমতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন। আর আমার জন্য আপনি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন এনে দিন। নিশ্চয় আমি আপনার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তভূর্ক্ত।” -সূরা আল-আহকাফ: আয়াত- ১৫

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মায়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ত্যাগের কথা উল্লেখ করেছেন— গর্ভধারণের কষ্ট,সন্তান জন্মদানের যন্ত্রণা,সন্তানকে দুধ পান করানো,দীর্ঘ সময় লালন-পালনের দায়িত্ব

“كُرْهًا”

শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে কঠিন কষ্ট ও দুর্ভোগ। অর্থাৎ একজন মা সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে যে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করেন, তা অন্য কোনো সম্পর্কের সাথে তুলনীয় নয়। এ কারণেই ইসলামে মায়ের মর্যাদা অত্যন্ত উঁচু।

কুরআনুল কারিমের অন্যত্র আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿23﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট (জীবদ্দশায়) বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের আচরণে বিরক্ত হয়ে 'উফ' শব্দটিও উচ্চারণ করো না (কিংবা তোমাদের আচরণে বিরক্ত হয়ে তারা 'উফ' শব্দ উচ্চারণ করতে বাধ্য হন এমনটিও করো না) এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল। আর তাদের উভয়ের জন্য দয়ার হাত

সম্প্রসারিত করে দাও এবং বল, হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন।" -সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩-২৪

"উফ" শব্দটি আরবিতে বিরক্তি প্রকাশের ক্ষুদ্রতম শব্দগুলোর একটি। আল্লাহ যখন এটিও নিষিদ্ধ করেছেন, তখন মায়ের সাথে রূঢ় আচরণ, অপমান কিংবা কঠোর ভাষায় কথা বলা যে সম্পূর্ণ হারাম—তা সহজেই বোঝা যায়। পিতা-মাতা যদি একজন অথবা উভয়ে বৃদ্ধ হয়ে যান তখন এমন শব্দ তাদের সামনে বলবেন না যাতে তারা মনে কষ্ট পান, বরং সম্মানের সাথে কথা বলবে, তোমাদের দয়ার ডানাকে তাদের ওপরে ছড়িয়ে দেবে এবং বলবে প্রভু আমার, তাদের প্রতি দয়া কর যেমনভাবে তারা স্নেহ দিয়ে আমাদের লালন করেছেন ছোটবেলায়।

মায়ের সম্মানের ওপরে এক সম্মানই আছে তা হলো আল্লাহর ইবাদাত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন __

{ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}

'তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে।' (সূরা আন-নিসা:৩৬)।

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, পিতা-মাতার অধিকার ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর হকের পরেই পিতা-মাতার হক উল্লেখ করা হয়েছে। এটি তাদের মর্যাদা ও অধিকারের গুরুত্ব প্রকাশ করে।

মায়ের সন্তুষ্টি জান্নাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। যে সন্তান মায়ের সেবা করে, তার জন্য জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত হয়। আর যে মাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহর অসন্তুষ্টির মুখোমুখি হয়।

এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الجنة تحت أقدام الأمهات

"জান্নাত মায়েদের পদতলে।"

—নাসায়ী

পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার একটি আবশ্যিক বিষয়, যদিও তারা অমুসলিম হন

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা ওয়াজিব। এমনকি যদি তারা অমুসলিম হন তবুও। তাদের মুসলিম হওয়ার সাথেও তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের বিষয়টি জড়িত নয়। আসমা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন__

(قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي؟، قَالَ :نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ)

‘একবার আমার মা আমার কাছে বেড়াতে এলেন। তিনি ছিলেন মুশরিকাহ। আর তখন কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি ছিল। আমি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মা আমার কাছে এসেছেন। তিনি আমার আতিথেয়তা পেতে আগ্রহী। তবে কি আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমার মায়ের সাথে তুমি সম্পর্ক রাখবে।’ (মুসলিম)

মাতা-পিতার সদ্ব্যবহারের নির্দেশ এখানেই শেষ নয়। বরং, তারা যদি আল্লাহর সাথে কুফরী করার নির্দেশও দেন এবং শিরক করতে বাধ্য করেন, তবু তাদের সাথে ভালো ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

{وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ .وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}

‘আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু’বছরে সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে

বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। আর অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে।' (সূরা লুকমান:১৪-১৫)

অর্থাৎ "কষ্টের পর কষ্ট" বাক্যাংশ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, মা প্রতিনিয়ত শারীরিক ও মানসিক ত্যাগ স্বীকার করেন। ইসলামে মায়ের উচ্চ মর্যাদার পেছনে এই আত্মত্যাগ গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

বক্ষমান আয়াত ও হাদিসে এটাই স্পষ্ট যে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা সর্বাবস্থায় ওয়াজিব, আর তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করার কোনো সুযোগ নেই। এটা স্পষ্ট মহাপাপ। গুনাহে কবিরাহ। কারণ, কুরআনের উল্লেখিত আয়াতের মর্ম অনুধাবনে বুঝা যায়, শিরক এর মত একটি মহাপাপের প্রতি পিতা-মাতার নির্দেশের পরও যখন অমুসলিম পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তাহলে একজন মুসলিম পিতা-মাতার অধিকার কতখানি হতে পারে। নিশ্চয় তাদের অধিকার সবচেয়ে বেশি। আর তা যথাযথভাবে আদায় করাও কঠিন। যে তা আদায় করতে পেরেছে, সে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লার তাওফিকপ্রাপ্ত ভাগ্যবানদের একজন।

জিহাদের চেয়েও পিতার-মাতার সেবার গুরুত্ব অধিক

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতা-মাতার অধিকারকে জিহাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন__

(سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ :الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، قَالَ :ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ :ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ :ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ :الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.)

'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি? তিনি বললেন, 'সময়মতো নামায আদায় করা'। আমি বললাম, এরপর? তিনি বললেন, 'পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার'। আমি বললাম, এরপর? তিনি বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ করা।' (বুখারী)

আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযি. হতে অপর এক বর্ণনায় নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন__

(رِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطِ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِد)

'পিতার সন্তুষ্টিতে রবের সন্তুষ্টি। আর পিতার অসন্তুষ্টিতে রবের অসন্তুষ্টি।' (তিরমিযী, সহীহ)

মুয়াবিয়া বিন জাহিমা রাযি বলেন__

(أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ، فَقَالَ :هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ :نَعَمْ، قَالَ :فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا)

'এক লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি যুদ্ধে যেতে চাই। আপনার কাছে পরামর্শের জন্য এসেছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মা আছে? লোকটি বলল, জ্বি আছে। তিনি বললেন, 'তাহলে তাকে সঙ্গ দাও। কেননা জান্নাত তার পদতলে।' (নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)।

অন্যদিকে যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে জীবিত পেয়েও জান্নাত অর্জন করতে পারল না, তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন_

(رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، قِيلَ :مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ :مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ)

'তার ধ্বংস হোক, তার ধ্বংস হোক, তার ধ্বংস হোক! জানতে চাওয়া হলো, কার কথা বলছেন ইয়া রাসুলাল্লাহ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার কোনো একজনকে বা উভয়কে বার্ধক্যে পেয়েছে, অথচ জান্নাতে যেতে পারল না।' (মুসলিম)।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল,

يا رسول الله من أبرُّ؟ قال :أُمّك، قال :ثم من؟ قال :أمَّك، قال :ثم من؟ قال أباك

“হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে বেশি ভালো ব্যবহারের উপযুক্ত ব্যক্তি কে?তিনি বললেন, তোমার মা।লোকটি আবার বললেন, তারপর কে?আল্লাহর রাসূল বললেন, তোমার মা।লোকটি আবারো বললেন, তারপর কে?
আল্লাহর রাসূল বললেন, তোমার পিতা।” – বুখারি, আদাবুল মুফরিদ; ৫৯৭১, মুসলিম; ৮৫

আলোচ্য হাদিসটির মাধ্যমে জানা যায় যে ৭৫% সম্মান মায়ের জন্য এবং পিতার জন্য ২৫% সম্মান। মায়ের জন্য রয়েছে চারভাগের তিনভাগ সম্মান, মর্যাদার প্রথমাংশ এমনকি উত্তমাংশ মাতার জন্য, বাকি চার ভাগের একভাগ সম্মান এবং মর্যাদা পিতার জন্য। অল্প পরিসরে বলতে গেলে স্বর্ণের পদক মায়ের জন্য, রৌপ্যের পদক পিতার জন্য, আবার ব্রোঞ্জের পদক মাতার জন্য হলে পিতার জন্য শুধু সান্ত্বনা পুরস্কার।

পিতা-মাতার নাম ধরে না ডাকা

পিতা-মাতা সন্তানের নিকটে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। সুতরাং তাদেরকে সর্বদা সম্মান করা কর্তব্য। আর এমন কোন কাজ উচিত নয়, যাতে তাদের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। যেমন তাদের নাম ধরে ডাকা। এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ .فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا :مَا هَذَا مِنْكَ؟ فَقَالَ :أَبِيْ .فَقَالَ :لاَ تُسَمِّهِ بِاسْمِهِ، وَلاَ تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلاَ تَجْلِسْ قَبْلَهُ.

‘আবু হুরায়রা (রাঃ) দুই ব্যক্তিকে দেখে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করেন, ইনি তোমার কি হন? সে বলল, তিনি আমার পিতা। তিনি বলেন, তাকে নাম ধরে ডেকো না, তার আগে আগে চলো না এবং তার সামনে বসো না’।

ওমর ইবনু যায়েদকে বলা হ’ল

كيف برُّ ابنك بك؟ قال :ما مشيت نهاراً قط إلا وهو خلفي، ولا مشيت ليلاً إلا مشى-
‘ ،أمامي، ولا رقى سقفاً وأنا تحته

আপনার ছেলে আপনার সাথে কিরূপ সদাচরণ করে? তিনি বলেন, আমি দিনে কখনো পথ চললে সে আমার পিছনে চলে। রাত্রে পথ চললে সে আমার সামনে চলে। আমি নীচে থাকলে সে ছাদে আরোহণ করে না’।

পিতা-মাতা অপমানিত হয় এমন কোন কাজ করা এবং যেসব কাজের কারণে তাদেরকে গালি দেওয়া হয় তদ্রূপ কোন কাজ করা যাবে না। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ-

‘আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কবীরা গুনাহসমূহের অন্যতম হ’ল নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া। তারা (ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিজের পিতা-মাতাকে কোন লোক কিভাবে গালি দিতে পারে? তিনি বললেন, সে অন্যের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, তখন সে তার মাকে গালি দেয়

মায়ের অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণতি

ইসলামে পিতা-মাতার অবাধ্যতা বিশেষত মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করাকে কবীরা গুনাহ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যে সন্তান মায়ের অবাধ্য হয়, তাকে কষ্ট দেয় কিংবা তার অধিকার নষ্ট করে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন—

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ...عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ

“আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জানাব না?... তা হলো পিতা-মাতার অবাধ্যতা।”। —সহিহ বুখারি ও মুসলিম

মায়ের অন্তরে কষ্ট দেওয়া, তার সাথে রূঢ় আচরণ করা, তার প্রয়োজন উপেক্ষা করা কিংবা বৃদ্ধ বয়সে তাকে একা ফেলে রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত মায়ের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট থাকা।

মায়ের দোয়া ও বদদোয়ার অলৌকিক ক্ষমতা

হাদিস শরিফে এসেছে, তিনটি দোয়া সরাসরি কবুল হয়, যার মাঝে কোনো সন্দেহ নেই; তার একটি হলো সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দোয়া।

- উওয়াইস আল-কারনী ছিলেন ইয়েমেনের একজন সাধারণ মানুষ। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বৃদ্ধ ও অন্ধ মায়ের সেবার কারণে মদীনা শরীফে এসে নবীজি (সা.)-এর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর মায়ের প্রতি এই একনিষ্ঠ সেবা ও মায়ের দোয়ার কারণে তিনি আল্লাহর কাছে এমন মাকাম লাভ করেছিলেন যে, নবীজি (সা.) তাঁর জীবদ্দশাতেই সাহাবিদের তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে যান। সহীহ মুসলিমের বর্ণনা (হাদিস নং ২৫৪২) আমিরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর কাছে যখন ইয়েমেনের কোনো কাফেলা আসত, তিনি উওয়াইস আল-কারনীর খোঁজ নিতেন। অবশেষে যখন তাঁর দেখা পেলেন, ওমর (রা.) বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: "তোমাদের কাছে ইয়েমেনের সাহায্যকারী দলের সাথে উওয়াইস ইবনে আমির আসবে... তাঁর একজন মা আছেন, যার প্রতি তিনি অত্যন্ত অনুগত ও সদাচারী। তিনি যদি কোনো বিষয়ে আল্লাহর নামে কসম খান, আল্লাহ তা অবশ্যই পূরণ করবেন। অতএব, তুমি যদি পারো তবে তাঁকে দিয়ে তোমার জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করিয়ে নিও।" সুবহানাল্লাহ, একজন প্রধান সাহাবী এবং খলীফা হয়েও হযরত ওমর (রা.) মায়ের সেবক উওয়াইসের কাছে নিজের জন্য দোয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন।

- ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী (র.) শৈশবেই পিতৃহীন হন এবং একপর্যায়ে অন্ধ হয়ে যান। চিকিৎসকেরা তাঁর চোখের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মা ছিলেন অত্যন্ত আবেদিনা ও পুণ্যবতী নারী।ঐতিহাসিক রেফারেন্স জীবনীগ্রন্থ এবং সহীহ বুখারীর ভূমিকায় বর্ণিত হয়েছে, ইমাম বুখারীর মা দিন-রাত আল্লাহর দরবারে তাঁর সন্তানের চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কান্নাকাটি করে দোয়া করতে থাকেন। এক রাতে তিনি স্বপ্নে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-কে দেখলেন। ইব্রাহিম (আ.) তাঁকে বললেন, "হে নারী! তোমার সন্তানের জন্য তোমার অবিরত ও আকুল দোয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা তোমার ছেলের

চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।" সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখা গেল, বালক বুখারীর চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ! মায়ের এই দোয়ার উসিলাতেই উম্মাহ পরবর্তীতে 'সহীহ বুখারী'-র মতো অমূল্য কিতাব উপহার পেয়েছে।

- মায়ের অসন্তুষ্টি ও জুরাইজের পরীক্ষা (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)মায়ের দোয়া যেমন সন্তানকে আরশে পৌঁছায়, তেমনি মায়ের সামান্য অসন্তুষ্টি বা বদদোয়া মুত্তাকী বান্দাকেও কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দেয়। বনী ইসরাইলের 'জুরাইজ' নামের এক পরম ইবাদতকারী ব্যক্তির ঘটনা রাসুল (সা.) নিজে বর্ণনা করেছেন।হাদিসের বিবরণ: জুরাইজ যখন তাঁর ইবাদত খানায় নফল নামাজ পড়ছিলেন, তখন তাঁর মা এসে তাঁকে ডাকলেন, "হে জুরাইজ!" জুরাইজ নামাজরত অবস্থায় দ্বিধায় পড়ে গেলেন যে নামাজের উত্তর দেবেন নাকি মায়ের ডাকের। তিনি নামাজ শেষ না করায় মা কষ্ট পেয়ে ফিরে গেলেন। পরপর তিনদিন এমন হওয়ার পর মা ক্ষুব্ধ হয়ে বদদোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! ব্যভিচারী নারীর মুখ না দেখা পর্যন্ত যেন তার মৃত্যু না হয়।"পরবর্তীতে এক ব্যভিচারী নারী জুরাইজের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয় যে, তার গর্ভের সন্তান জুরাইজের। মানুষ জুরাইজের উপাসনালয় ভেঙে ফেলে এবং তাঁকে মারধর করে। কিন্তু জুরাইজ আল্লাহর ইবাদতকারী হওয়ায় এবং মায়ের দোয়া কেবল 'মুখ দেখার' মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় আল্লাহ তাঁকে অলৌকিকভাবে বাঁচিয়ে দেন। জুরাইজ নবজাতক শিশুর পেটে টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা কে? শিশুটি অলৌকিকভাবে কথা বলে উঠল এবং এক রাখালকে তার পিতা বলে উল্লেখ করল। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, নফল ইবাদতের চেয়েও মায়ের ডাকের জবাব দেওয়া ও তাঁকে সন্তুষ্ট রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে কতটা জরুরি।

মায়ের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির আধ্যাত্মিক ও জাগতিক প্রভাব (দোয়া ও বদদোয়া)ইসলামী ধর্মতত্ত্বে মায়ের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান তথা তাঁর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির সাথে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জাগতিক সফলতার সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। শরিয়তের দৃষ্টিতে মায়ের দোয়া ও বদদোয়ার পরিণাম অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী, দোয়ার তাৎক্ষণিক

কার্যকারিতা (قبولية الدعاء): ইসলামে যে কয়টি দোয়া আল্লাহর দরবারে সরাসরি এবং অবিলম্বে কবুল হয়, তার মধ্যে সন্তানের জন্য মায়ের দোয়া অন্যতম।
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:"তিনটি দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল হয়— মজলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং সন্তানের জন্য পিতা-মাতার (মায়ের) দোয়া।" (সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং: ১৯০৫)।

জাগতিক কল্যাণ ও রিজিকে বরকত: মায়ের সন্তুষ্টি এবং তাঁর দোয়ার বরকতে সন্তানের জীবনে অর্থনৈতিক ও জাগতিক কল্যাণ (বরকত) সাধিত হয়।
ফিকহ শাস্ত্রের আলেকদের মতে, মায়ের সেবা ও দোয়ার মাধ্যমে সন্তানের আয়ু ও রিজিকে প্রবৃদ্ধি ঘটে।
বদদোয়ার অনিবার্য পরিণতি (পার্থিব শাস্তি): মায়ের অবাধ্যতা বা তাঁর মন ভাঙার ফলে যে বদদোয়া বা দীর্ঘশ্বাস বের হয়, তা সরাসরি আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ইসলাম সতর্ক করেছে যে, অন্যান্য গুনাহের শাস্তি পরকালে হলেও মায়ের বদদোয়া ও অবাধ্যতার শাস্তি আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই দিয়ে দেন।
রাসূল (সা.) বলেন:"আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে বান্দার সমস্ত গুনাহ কিয়ামত পর্যন্ত স্থগিত রাখতে পারেন (পরকালে শাস্তি দেবেন), কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি তিনি মৃত্যুর আগেই দুনিয়াতে ভোগ করান।" (শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদিস নং: ৭৪১৩)।

ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত: সন্তান যতই ইবাদত-বন্দেগি করুক না কেন, মা যদি তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট থাকেন, তবে সেই ইবাদত আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না। বিখ্যাত সাহাবি হযরত আলকামা (রা.)-এর মৃত্যুর সময়ের ঘটনাটি এর অন্যতম ঐতিহাসিক প্রমাণ, যেখানে মায়ের ক্ষমা না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর মুখে কালিমা উচ্চারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

মায়ের প্রতি সন্তানের করণীয়

মায়ের অধিকার আদায় করা শুধু আবেগের বিষয় নয়; বরং এটি সন্তানের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি দায়িত্ব। তাই প্রত্যেক সন্তানের উচিত মায়ের সাথে সর্বদা উত্তম আচরণ করা এবং তার প্রয়োজনের প্রতি যত্নবান হওয়া।

মায়ের প্রতি সন্তানের গুরুত্বপূর্ণ কিছু করণীয় হলো—

- মায়ের সাথে কোমল ও সম্মানজনক ভাষায় কথা বলা।
- তার প্রয়োজন ও আর্থিক চাহিদা পূরণ করা।
- অসুস্থ অবস্থায় তার সেবা-যত্ন করা।
- তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তাকে গুরুত্ব দেওয়া।
- তার জন্য নিয়মিত দোয়া করা।
- মৃত্যুর পর তার মাগফিরাত কামনা করা ও সদকা করা।
- মায়ের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

এভাবেই একজন সন্তান প্রকৃত অর্থে মায়ের হক আদায় করতে পারে এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

অর্থনৈতিক ও আইনি অধিকারসমূহে ইসলামে মায়ের মর্যাদা কেবল নৈতিক বা আধ্যাত্মিক বাণীতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা সুনির্দিষ্ট আইনি ও অর্থনৈতিক অধিকার দ্বারা সুরক্ষিত।

বাধ্যতামূলক খোরপোশ বা ভরণপোষণ (Nafaqah): ইসলামী ফিকহ ও পারিবারিক আইন অনুযায়ী, কোনো মা যদি নিজের ভরণপোষণে অক্ষম হন এবং সন্তান যদি প্রাপ্তবয়স্ক ও উপার্জনক্ষম হয়, তবে মায়ের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করা সন্তানের ওপর আইনিভাবে ফরজ (Obligatory)। সন্তান অবহেলা করলে মা আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার রাখেন।

উত্তরাধিকার স্বত্ব (Inheritance Property): ইসলামী মিরাস (উত্তরাধিকার) আইনে মায়ের অংশ কোনো অবস্থাতেই খর্ব বা বাতিল করা যায় না। মৃত সন্তানের কোনো সন্তান বা একাধিক ভাইবোন থাকলে মা সম্পত্তির ১/৬ (ছয় ভাগের এক ভাগ) পাবেন।

আর সন্তান বা ভাইবোন কেউ না থাকলে মা মোট সম্পত্তির ১/৩ (তিন ভাগের এক ভাগ) এর আইনগত মালিক হবেন (সূরা নিসা, আয়াত: ১১)।

মৃত্যুর পরে তাদের কবর যিয়ারত করা

পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে তাদের কবর যিয়ারত করা। এতে যেমন তাদের কথা স্মরণ হবে, তেমনি তাদের প্রতি কর্তব্য অন্তরে জাগরুক থাকবে। তাই তাদের কবর যিয়ারত করা এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, যাতে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদেরকে জান্নাত দান করেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করেন।

এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّىْ فِىْ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِىْ أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِى فَزُوْرُوْا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ-

'নবী করীম (ছাঃ) একবার নিজের মায়ের কবরে গেলেন। সেখানে তিনি নিজেও কাঁদলেন এবং তাঁর আশপাশের লোকদেরকেও কাঁদালেন। তারপর বললেন, আমি আমার মায়ের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে আল্লাহর কাছে অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হ'ল না। তারপর আমি আমার মায়ের কবরের কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হ'ল। তাই তোমরা কবরের কাছে যাবে। কারণ কবর মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়'।

মাতার মৃত্যুর পরবর্তী অন্যান্য অধিকারসমূহ

ইসলাম মায়ের জীবদ্দশার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মৃত্যুর পরও তাঁর প্রতি সন্তানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে। মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর জন্য দোয়া করা, সদকা করা, ঋণ পরিশোধ করা এবং তাঁর সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করা সন্তানের নৈতিক ও ধর্মীয় কর্তব্য।

প্রথমত, মায়ের মাগফিরাত ও রহমতের জন্য সর্বদা দোয়া করা সন্তানের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। আল-কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন—

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থঃ "হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে তাঁরা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছিলেন।"— সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:২৪

দ্বিতীয়ত, মায়ের রূহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে দান-সদকা ও জনকল্যাণমূলক কাজ করা উত্তম আমল। রাসুলুল্লাহ (সা.) মৃত মায়ের পক্ষ থেকে সদকা করার অনুমতি প্রদান করেছেন।— সহীহ বুখারী, হাদিস: ২৭৬০

তৃতীয়ত, মা যদি কারও কাছে ঋণগ্রস্ত থাকেন বা কোনো শরিয়তসম্মত অসিয়ত করে যান, তবে তা যথাযথভাবে পূরণ করা সন্তানের দায়িত্ব। ইসলামে মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থত, মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখাও ইসলামের শিক্ষা। রাসুল (সা.) বলেন— "সবচেয়ে বড় সদ্ব্যবহার হলো পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।"— সহীহ মুসলিম, হাদিস: ২৫৫২

ইসলাম নারীর "মা" পরিচয়কে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। কোরআন ও হাদিসে মায়ের সম্মান, সেবা, আনুগত্য ও সন্তুষ্টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একজন মা সন্তানের জন্য যে অসীম ত্যাগ স্বীকার করেন, তার প্রতিদান কোনোভাবেই পূর্ণরূপে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য হলো মায়ের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা।

বর্তমান সমাজে বৃদ্ধ মায়ের প্রতি অবহেলা ও অসদাচরণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করলে পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমাজে মানবিক মূল্যবোধ সুদৃঢ় হবে। তাই মুসলিম সমাজের প্রত্যেক সদস্যের উচিত মায়ের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা এবং তাকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করা।

- **ইসলামে স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার**

ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি সম্পর্ককে ভারসাম্য, ন্যায়বিচার ও মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে গঠন করেছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও ইসলামের দৃষ্টিতে কেবল পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের মাধ্যম নয়; বরং এটি পারস্পরিক ভালোবাসা, সহমর্মিতা, দয়া ও মানসিক প্রশান্তির এক পবিত্র বন্ধন। ইসলাম স্ত্রীকে কেবল গৃহের একজন সদস্য হিসেবে নয়, বরং পরিবার ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। এজন্য ইসলাম স্ত্রীকে সম্মান, সদাচরণ, নিরাপত্তা, মতামত প্রদান, ন্যায়বিচার ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার প্রদান করেছে।

ইসলাম-পূর্ব জাহেলি সমাজে নারীরা স্বামীর নিকট অবহেলিত ও নির্যাতিত ছিল। তাদের কোনো স্বাধীন মতামত, সম্মান কিংবা সামাজিক মর্যাদা ছিল না। ইসলাম এসে এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটায় এবং স্ত্রীকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে অধিষ্ঠিত করে। কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে দেখা যায়, ইসলামে স্ত্রী কেবল স্বামীর অধীনস্থ ব্যক্তি নয়; বরং পারিবারিক জীবনের একজন সম্মানিত ও অধিকারসম্পন্ন অংশীদার।

সম্মান ও মর্যাদার অধিকার

ইসলাম স্ত্রীকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে জীবনযাপনের অধিকার দিয়েছে। স্বামীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন সে স্ত্রীর সাথে কোমল, ভদ্র ও মানবিক আচরণ করে। দাম্পত্য জীবনে রূঢ়তা, অপমান ও অবজ্ঞার পরিবর্তে সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখার শিক্ষা ইসলাম প্রদান করেছে। কারণ পরিবারে শান্তি ও স্থিতিশীলতা অনেকাংশে নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মানবোধের উপর। এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।"

— সূরা আন-নিসা : ১৯

এই আয়াতে "بِالْمَعْرُوفِ" শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ হলো উত্তম আচরণ, ভদ্রতা, সহানুভূতি ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য সুন্দর ব্যবহার। অর্থাৎ ইসলাম স্বামীকে

কেবল ভরণ-পোষণ দানের নির্দেশ দেয়নি; বরং স্ত্রীর মানসিক মর্যাদা রক্ষা করাকেও আবশ্যক করেছে।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"— সূরা আর-রূম : ২১

এই আয়াতে দাম্পত্য জীবনের মূল ভিত্তি হিসেবে "মাওয়াদ্দাহ" (ভালোবাসা) ও "রাহমাহ" (দয়া)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কর্তৃত্বের নয়; বরং পারস্পরিক মমতা ও ভালোবাসার সম্পর্ক।

এ আয়াত সম্পর্কে তাফসীর এর ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ তোমাদেরই মধ্যে থেকে নারী জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তারা তোমাদের স্ত্রী হয় এবং তোমরা এক অপরের সঙ্গী বা জোড়া জোড়া হয়ে যাও। আরবীতে زَوج এর অর্থ হল সঙ্গী বা জোড়া। অতএব পুরুষ নারীর ও নারী পুরুষের সঙ্গী বা জোড়া। নারীদেরকে পুরুষদের মধ্য হতেই সৃষ্টি করার অর্থ হল, পৃথিবীর প্রথম নারী মা হাওয়াকে আদম (আঃ)-এর বাম পার্শেবর (পাঁজরের) হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর তাঁদের দুই জন হতে মানুষের জন্মের (স্বাভাবিক) ধারাবাহিকতা আরম্ভ হয়েছে।

অর্থাৎ, যদি পুরুষ ও নারী আলাদা আলাদা বস্তু হতে সৃষ্টি হত; যেমন যদি নারী জ্বিন অথবা চতুষ্পদ জন্তু থেকে সৃষ্টি হত, তাহলে তাদের উভয়ের একই বস্তু হতে সৃষ্টি হওয়াতে যে সুখ-শান্তি পাওয়া যায় তা কখনই পাওয়া সম্ভব হত না। বরং এক অপরকে অপছন্দ করত ও জন্তু জানোয়ারের ন্যায় ব্যবহার করত। সুতরাং মানুষের প্রতি আল্লাহর অশেষ দয়া যে, তিনি মানুষের জুড়ি ও সঙ্গিনী মানুষকেই বানিয়েছেন।

مَوَدَّة

এর অর্থ হল স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সুমধুর ভালবাসা যা সাধারণত পরিলক্ষিত হয়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যেরূপ ভালবাসা সৃষ্টি হয় অনুরূপ ভালবাসা পৃথিবীর অন্য কোন দুই ব্যক্তির মাঝে হয় না। আর رَحمَة (মায়া-মমতা) হল এই যে, স্বামী নিজ স্ত্রীকে সর্বপ্রকার

সুখ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ দান করে থাকে। অনুরূপ স্ত্রীও নিজের সাধ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী স্বামীর সেবা করে থাকে। মহান আল্লাহ উভয়ের উপরেই সে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। বলা বাহুল্য, মানুষ এই শান্তি ও অগাধ প্রেম-ভালবাসা সেই দাম্পত্যের মাধ্যমেই লাভ করতে পারে যার সম্পর্কের ভিত্তি শরীয়তসম্মত বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। পরন্তু ইসলাম একমাত্র বিবাহসূত্রের মাধ্যমেই সম্পৃক্ত দম্পতিকেই জোড়া বলে স্বীকার করে। অন্যথায় শরীয়ত-বিরোধী দাম্পত্যের (লিভ টুগেদারের) সম্পর্ককে ইসলাম জোড়া বলে স্বীকার করে না। বরং তাদেরকে ব্যভিচারী আখ্যায়িত করে এবং তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান প্রয়োগ করে। আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার পতাকাবাহী শয়তানরা এই নোংরা প্রচেষ্টায় লিপ্ত যে, পাশ্চাত্য সমাজের মত ইসলামী দেশেও বিবাহকে অপ্রয়োজনীয় স্বীকার করে অনুরূপ (অবৈধ প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ লিভ টুগেদারের) নারী-পুরুষকে জোড়া, যুগল বা দম্পতি (COUPLE) হিসেবে মেনে নেওয়া হোক এবং তাদের জন্য শাস্তির পরিবর্তে ঐ সকল অধিকার দেওয়া ও মেনে নেওয়া হোক, যে অধিকার একজন শরীয়তসম্মত দম্পতি পেয়ে থাকে! (আল্লাহ তাদেরকে সর্বত্রই ধ্বংস করেন।)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।”— সুনান তিরমিজি

এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন উত্তম মুসলিমের পরিচয় দিয়েছেন তার পারিবারিক আচরণের মাধ্যমে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করে, ইসলাম তার চরিত্রকে সর্বোত্তম বলে আখ্যায়িত করেছেন। নবীজির (সা.) জীবনের বাস্তব ঘটনা দেখা যায় রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনোই ঘরের কাজকে কেবল নারীর কাজ মনে করতেন না, বরং তিনি নিজে স্ত্রীদের কাজে হাত বাড়াতেন। আম্মাজান আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘরে কী করতেন?" তিনি উত্তরে বলেন, "তিনি ঘরের মানুষের কাজে সহযোগিতা করতেন (সংসারের কাজে সাহায্য করতেন) এবং সালাতের সময় হলে সালাতে চলে যেতেন।" (সহীহ বুখারী)

আরেকটি মধুর ঘটনা:খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মা সাফিয়া (রা.)-কে বিয়ে করে ফিরছিলেন, তখন সাফিয়া (রা.)-কে উটের পিঠে চড়ানোর জন্য বিশ্বনবী (সা.) নিজে মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন। মা সাফিয়া (রা.) আল্লাহর রাসূলের হাঁটুর ওপর পা দিয়ে ভর করে পরম সম্মানের সাথে উটের পিঠে আরোহণ করেছিলেন।

উল্লেখিত ঘটনাদ্বয় দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রমাণ করেছেন পরিবারে কিভাবে সর্বোত্তম আচরণ করতে হয়।

ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সদাচরণ পাওয়ার অধিকার

ইসলাম স্ত্রীকে কেবল আনুষ্ঠানিক অধিকারই দেয়নি; বরং তার মানসিক অনুভূতি ও আবেগের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যেন ভালোবাসা, সহানুভূতি ও আন্তরিকতার মাধ্যমে পরিচালিত হয়, ইসলাম সে নির্দেশ প্রদান করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীর প্রতি কোমল আচরণকে ঈমানের পূর্ণতার নিদর্শন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি কখনো স্ত্রীদের সাথে কঠোর আচরণ করতেন না; বরং তাদের সাথে হাসি-আনন্দ, পরামর্শ ও আন্তরিক আচরণ করতেন। হাদিসে বর্ণিত আছে, তিনি যখন রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, ঘরের দরজা খুব আস্তে খুলতেন যাতে ঘরের লোকদের ঘুমে ব্যাঘাত না ঘটে। আরো বর্ণিত আছে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুছল্লায় দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন তখন ঘুমের অবস্থায় মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার পা মুছল্লার উপর চলে আসতো। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় যাওয়ার সময় কোমলভাবে মা আয়েশা (রা.)-এর পা সরিয়ে তবে সিজদায় যেতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৮২; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৫১২)

এজন্য কখনো বিরক্তি বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন না। সুবহানাল্লাহ! উল্লেখিত ঘটনায় স্ত্রীর প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোমল আচরণের দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে।এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন— اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

"তোমরা নারীদের সাথে উত্তম আচরণ করো।"— সহিহ বুখারি

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ জীবনে স্ত্রীদের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সদাচরণের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন এবং প্রথমবার তিনি জয়ী হয়েছিলেন। পরে আরেক সময় রাসূল ﷺ জয়ী হলে হাসিমুখে বলেন, "এটি সেই জয়ের প্রতিদান।" — সুনান আবু দাউদ

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের সাথে আন্তরিক ও আনন্দপূর্ণ আচরণ করতেন। তিনি দাম্পত্য জীবনকে কঠোরতা বা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং ভালোবাসা, হাসি-আনন্দ ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের মাধ্যমে তা সুন্দর ও প্রশান্তিময় করে তুলেছিলেন। এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজের জন্য তিনি এক উত্তম আদর্শ স্থাপন করেছেন।

অন্য হাদিসে তিনি বলেন—

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

"কোনো মুমিন পুরুষ যেন মুমিন নারীকে ঘৃণা না করে। তার একটি স্বভাব অপছন্দ হলে অন্য স্বভাব পছন্দ করবে।"— সহিহ মুসলিম

এই হাদিস পারিবারিক জীবনে ধৈর্য, সহনশীলতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষা দেয়। ইসলাম দাম্পত্য সম্পর্ককে ভাঙনের নয়; বরং সমঝোতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত করতে উৎসাহিত করেছে।

নিরাপত্তা ও সুরক্ষার অধিকার

ইসলাম স্ত্রীকে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার দিয়েছে। স্বামীকে পরিবারের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যেন সে স্ত্রীকে নিরাপদ ও সম্মানজনক পরিবেশ প্রদান করে। ইসলামে নারীর প্রতি জুলুম, অপমান, অবহেলা কিংবা নির্যাতনকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে। কারণ ইসলাম মানব মর্যাদাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

“পূর্ণাঙ্গ মুমিন সেই ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।” — সুনান আত-তিরমিযি

এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের উত্তম চরিত্র ও পূর্ণ ঈমানের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণকে উল্লেখ করেছেন। কারণ একজন মানুষের প্রকৃত চরিত্র পরিবার ও আপনজনদের সাথে আচরণের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। তাই ইসলামে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা, সম্মান ও কোমল আচরণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
বিদায় হজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে নারীদের অধিকার সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে ইসলাম স্ত্রীকে নিরাপদ, সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রদানের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে।

এ হাদিসের বাস্তব দৃষ্টান্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনেই পরিলক্ষিত হয়। হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আবিসিনিয়ার কিছু লোক মসজিদে নববীতে বর্শাখেলা প্রদর্শন করছিল। আয়িশা (রা.) তা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিজের পেছনে দাঁড় করিয়ে সেই খেলা দেখার সুযোগ দেন। তিনি ধৈর্যসহকারে দাঁড়িয়ে ছিলেন যতক্ষণ না আয়িশা (রা.) নিজেই সরে যেতে চেয়েছিলেন।— সহিহ বুখারি

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, রাসূল ﷺ শুধু কথার মাধ্যমে নয়; বরং বাস্তব জীবনেও স্ত্রীদের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সম্মান প্রদর্শনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর জীবন মুসলিম সমাজের জন্য সর্বোত্তম

মতামত ও পরামর্শ প্রদানের অধিকার

ইসলাম স্ত্রীকে পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়ে মতামত প্রকাশের অধিকার দিয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে বহু ঘটনায় দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করেছেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উম্মে সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেছিলেন। সেই পরামর্শ মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছিল। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে ইসলাম নারীর প্রজ্ঞা, চিন্তাশক্তি ও মতামতের মূল্যায়ন করেছে। ইসলাম স্ত্রীকে কেবল গৃহস্থালির সীমাবদ্ধ ব্যক্তিতে পরিণত করেনি; বরং পরিবার পরিচালনায় তাকে একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

ন্যায়সঙ্গত আচরণ পাওয়ার অধিকার

ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি ন্যায়বিচার ও সুবিচার করার নির্দেশ দিয়েছে। বিশেষত একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করা ইসলাম বাধ্যতামূলক করেছে।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"যদি আশঙ্কা কর যে ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তবে একটিই যথেষ্ট।" — সূরা আন-নিসা : ৩
এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে পারিবারিক জীবনে অবিচার ও বৈষম্যের কোনো স্থান নেই।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

"যার দুই স্ত্রী রয়েছে এবং সে একজনের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসবে যে তার শরীরের এক পাশ ঝুলে থাকবে।"— সুনান আবু দাউদ
এই হাদিস পারিবারিক জীবনে ন্যায়পরায়ণতার গুরুত্ব অত্যন্ত কঠোরভাবে তুলে ধরেছে।

ইসলামে স্ত্রী হিসেবে নারীর সামাজিক অধিকারকে অত্যন্ত মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলাম স্ত্রীকে কেবল ভরণ-পোষণ বা গৃহস্থালির দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং তাকে সম্মান, ভালোবাসা, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, মতামত প্রকাশ ও মানসিক প্রশান্তির অধিকার প্রদান করেছে। কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রতীয়মান হয় যে ইসলামে স্ত্রী পরিবার ও সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ, সম্মানিত ও মর্যাদাবান সদস্য। ইসলামের এই বিধানসমূহ পারিবারিক জীবনে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- **ইসলামে কন্যা হিসেবে নারীর অধিকার**

ইসলাম কন্যাসন্তানকে আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত ও রহমত হিসেবে ঘোষণা করেছে। জাহেলি যুগে যেখানে কন্যাসন্তানকে অবজ্ঞা করা হতো, এমনকি জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো নিষ্ঠুর প্রথাও চালু ছিল, সেখানে ইসলাম এসে মেয়েদের মর্যাদা, ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। একজন মেয়ে শিশু জন্মের পর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত পরিবার ও সমাজে সম্মান ও যত্ন পাওয়ার অধিকার রাখে। ইসলাম কন্যাসন্তানের জন্মকে লজ্জা বা অপমান নয়; বরং কল্যাণ হিসেবে ঘোষণা করেছে। মেয়েশিশুকে হত্যা করা বা অবহেলা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এমনকি ইসলাম দারিদ্র্য, লজ্জা বা সামাজিক কুসংস্কারের কারণে সন্তান হত্যা ও কন্যাভ্রূণ হত্যাকে ও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

অর্থঃ "দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিযিক দান করি এবং তোমাদেরকেও।"
— সূরা আল-ইসরা : ৩১

পবিত্র কোরআনে কন্যা সন্তান হত্যার মানসিকতাকে জঘন্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। সূরা নাহলের ৫৮ ও ৫৯নং আয়াতে বলা হয়েছে 'যখন তাদের (মক্কার পৌত্তলিকদের) কাউকে কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার খবর দেওয়া হতো তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায়। ক্রোধে সে জ্বলতে থাকে। তাকে যে বিষয়ে খবর দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ কন্যা সন্তান জন্মের), সেই লজ্জায় সে সমাজের লোকদের কাছ থেকে পাশ কাটিয়ে চলে। (সে চিন্তা করে) লাঞ্ছনা ভোগ করে কন্যা সন্তান রেখে দেবে না তাকে মাটিতে পুতে ফেলবে।" ইসলাম এ ধরনের কুপ্রথা শুধু নিষিদ্ধই করেনি বরং এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ

অর্থঃ “যখন জীবন্ত কবর দেওয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে— কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?” — সূরা আত-তাকভীর : ৮-৯

এই আয়াত কন্যাসন্তানের জীবন ও মর্যাদার অধিকারকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইসলাম পিতা-মাতাকে কন্যাসন্তানের প্রতি দয়া, স্নেহ ও কোমল আচরণের নির্দেশ দিয়েছে। কন্যাদের লালন-পালনকে জান্নাত লাভের মাধ্যম বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«من كانت له أنثى فلم يئدها، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله تعالى الجنّة»

অর্থঃ “কোনো ব্যক্তির যদি একজন কন্যা সন্তান থাকে এবং সে তাকে হত্যা না করে, অবহেলা না করে এবং পুত্র সন্তানকে তার ওপর প্রাধান্য না দেয়, তবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।”— মুসনাদে আহমদ

অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«من كان له ثلاث بناتٍ وصبر عليهنَّ، وكساهنَّ من جِدَته، كنَّ له حجاباً من النار»

অর্থঃ “যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান থাকবে এবং সে তাদের লালন-পালনে ধৈর্য ধারণ করবে ও উত্তম পোশাক প্রদান করবে, তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিবন্ধক হবে।”— সুনানে ইবনে মাজাহ

ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

«من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضمَّ أصابعه»

অর্থঃ “যে ব্যক্তি দুই কন্যা সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এভাবে একসাথে থাকব।” এরপর তিনি নিজের দুই আঙুল একত্র করে দেখান।— সহীহ মুসলিম। আরও বর্ণিত হয়েছে—

«من عال ابنتين أو ثلاث بنات، أو أختين، أو ثلاث أخوات، حتى يبلغن، أو يموت عنهنَّ، أنا وهو كهاتين»

অর্থঃ “যে ব্যক্তি দুই বা তিন কন্যা কিংবা দুই বা তিন বোনকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, জান্নাতে আমি ও সে এ দুই আঙুলের ন্যায় একসাথে থাকব।”— মুসনাদে আহমদ

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«من كان له ثلاث بناتٍ يؤويهنَّ، ويكفيهنَّ، ويرحمهنَّ، فقد وجبت له الجنّة»

অর্থঃ "যার তিনটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদের আশ্রয় দেয়, ভরণ-পোষণ করে ও দয়া করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত।"
সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, দুইজন হলেও কি একই ফযীলত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "দুইজন হলেও।"— আল-আদাবুল মুফরাদ

ইসলাম সন্তানদের মধ্যে বৈষম্য করতে নিষেধ করেছে। ছেলে ও মেয়ের মধ্যে অবিচার করা ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

অর্থঃ "আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ন্যায়বিচার কর।"— সহীহ বুখারি
এ নির্দেশ ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।
ইসলাম কন্যাসন্তানের প্রতি স্নেহ, সম্মান ও কোমল আচরণের নির্দেশ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-এর প্রতি অত্যন্ত ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি ফাতিমা (রা.) আসলে দাঁড়িয়ে যেতেন, তাকে নিজের স্থানে বসাতেন এবং স্নেহ প্রকাশ করতেন। এর মাধ্যমে ইসলাম কন্যাসন্তানকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।
এছাড়া ইসলাম নারীকে জ্ঞান অর্জনের পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। একজন মেয়েকে দ্বীনি ও প্রয়োজনীয় পার্থিব শিক্ষা প্রদান করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। তাছাড়া একজন মেয়ের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান ও নিরাপত্তার দায়িত্ব পিতা বা অভিভাবকের উপর বর্তায়। ইসলাম কন্যাসন্তানের যত্নকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করেছে।

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও ইসলাম কন্যাকে পরিপূর্ণ অধিকার প্রদান করেছে। ইসলাম কন্যাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেনি; বরং নির্ধারিত অংশ প্রদান করেছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

অর্থঃ "আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (উত্তরাধিকার) সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন— এক ছেলের অংশ দুই মেয়ের অংশের সমান।"— সূরা আন-নিসা : ১১

ওহুদ যুদ্ধে সাহাবি হযরত সাদ ইবনে রাবী (রা.) শহীদ হওয়ার পর তাঁর ভাই জাহেলি যুগের নিয়ম অনুযায়ী সাদের সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নেয় এবং সাদের দুই কন্যাকে

কিছুই দেয়নি। তখন সাদের স্ত্রী দুই কন্যাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে বিচার প্রার্থনা করেন। এরপর উত্তরাধিকারের আয়াত নাজিল হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) সাদের দুই কন্যাকে তাদের প্রাপ্য সম্পত্তি প্রদান করার নির্দেশ দেন। এটি ছিল ইসলামে কন্যাদের উত্তরাধিকারের বাস্তব প্রয়োগের অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইসলামে কন্যা সন্তান কেবল উত্তরাধিকার সূত্রেই সম্পদ পায় না; বরং সেই সম্পদের ওপর তার স্বাধীন মালিকানার অধিকারও রয়েছে। পিতা, ভাই বা স্বামী— কেউই তার অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ ব্যবহার করতে পারে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

"পুরুষ যা অর্জন করে তা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার অংশ।"— সূরা আন-নিসা : ৩২

পারিবারিক নীতিনির্ধারণেও ইসলাম কন্যার মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছে। পবিত্র কোরআনে হযরত শু'আইব (আ.)-এর কন্যাদের ঘটনার মাধ্যমে এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হযরত মুসা (আ.) যখন মাদইয়ানে আসেন, তখন শু'আইব (আ.)-এর এক কন্যা তাঁর পিতাকে পরামর্শ দিয়ে বলেন—"হে পিতা! আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন। নিশ্চয়ই উত্তম মজুর সেই, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।"— সূরা আল-কাসাস : ২৬

এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, ইসলাম কন্যার প্রজ্ঞা ও মতামতকে মূল্যায়ন করেছে।

তাছাড়া ইসলাম প্রাপ্তবয়স্ক কন্যার বিবাহের ক্ষেত্রে তার মতামত ও সম্মতিকে অপরিহার্য করেছে। অভিভাবক বা পিতা জোরপূর্বক কোনো কন্যার অমতে বিয়ে দিতে পারেন না। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

لاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

অর্থঃ "কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না।"— সহীহ বুখারী, হাদিস : ৫১৩৬

এ প্রসঙ্গে হযরত খানসা বিনতে খিধাম (রা.)-এর ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পিতা তাঁর অমতে বিবাহ ঠিক করলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে অভিযোগ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) সেই বিবাহ বাতিল করে দেন এবং মেয়েটির মতামতকে

প্রাধান্য দেন। এর মাধ্যমে ইসলাম নারীর সম্মতি ছাড়া জোরপূর্বক বিবাহকে নিষিদ্ধ করেছে।

মূলত ইসলাম কন্যাসন্তানকে অবজ্ঞা বা বোঝা হিসেবে নয়; বরং পরিবার ও সমাজের মর্যাদাপূর্ণ সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জীবন, শিক্ষা, ভালোবাসা, মতামত, সম্পদ ও নিরাপত্তার অধিকার প্রদান করে ইসলাম নারীকে সম্মান ও মর্যাদার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

- **ইসলামে বোন হিসেবে নারীর অধিকার**

ইসলামে নারীর অধিকার কেবল অর্থনৈতিক বা উত্তরাধিকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং একজন নারী যখন বোন হিসেবে পরিবার ও সমাজে অবস্থান করে, তখন তার সামাজিক মর্যাদা, মানসিক নিরাপত্তা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং মানবিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম অত্যন্ত সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রদান করেছে। জাহেলি যুগে যেখানে বোনদের অবহেলা, অসম্মান ও বঞ্চনার চোখে দেখা হতো, ইসলাম সেখানে বোনকে পরিবার ও সমাজের একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামি পারিবারিক ব্যবস্থায় একজন বোনের জীবন যেন নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়— সে জন্য শিক্ষা, বিবাহ, সামাজিক নিরাপত্তা, ভালোবাসা, সম্মান এবং পারিবারিক সহযোগিতার মতো মৌলিক বিষয়গুলোকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নিচে এসব অধিকার বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো

সুশিক্ষা ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার

জাহেলি যুগে কন্যাসন্তান বা বোনদের বোঝা মনে করা হতো। অনেক পরিবারে ছেলে সন্তানদের তুলনায় মেয়েদের অবহেলা করা হতো এবং তাদের জ্ঞানচর্চা বা উন্নত জীবনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা হতো। ইসলাম এসে এই বৈষম্যমূলক ধারণার অবসান ঘটিয়ে নারীকে শিক্ষা, মর্যাদা ও সম্মানজনক জীবনের অধিকার প্রদান করে। পরিবারে ভাইদের পাশাপাশি বোনদেরও সমান সুযোগ ও মানবিক মর্যাদা দেওয়া ইসলামের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا - يَعْنِي الذُّكُورَ - أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ»

অনুবাদ: আবু সাঈদ আল-খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যার কোনো কন্যাসন্তান বা বোন থাকে, আর সে তাকে জীবন্ত দাফন করেনি, অপমান করেনি এবং নিজের পুত্রদের তার ওপর প্রাধান্য দেয়নি, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৫১৪৭)
এই হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পরিবারে ভাইদের উচ্চশিক্ষা, উন্নত সুযোগ-সুবিধা ও সামাজিক মর্যাদা প্রদান করে বোনদের বঞ্চিত করা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অনৈতিক। বোনের অন্যতম মৌলিক অধিকার হলো— সে বৈষম্যহীন পরিবেশে আত্মমর্যাদার সঙ্গে বড় হবে এবং জ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমান সুযোগ লাভ করবে।

ইসলামের ইতিহাসেও এর বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায়। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ছিলেন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী আলেম। অসংখ্য সাহাবি তাঁর নিকট থেকে হাদিস, ফিকহ ও ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম নারীর জ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে।

বৈবাহিক পছন্দে মতামত প্রকাশের অধিকার

ইসলাম একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মতামতের মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার সম্মতিকে অপরিহার্য করা হয়েছে। কোনো অভিভাবক, পিতা বা ভাই জোরপূর্বক বোনের অমতে তাকে বিয়ে দিতে পারে না।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»

অনুবাদ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) বলেছেন: "কোনো নারীকে তার মতামত ও অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না।"(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫১৩৬)

এই বিধানের বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায় সাহাবিয়া খানসা বিনতে খিজাম (রা.)-এর ঘটনায়। তাঁর পিতা তাঁর অনুমতি ছাড়া বিয়ে ঠিক করলে তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট অভিযোগ করেন। নবী করিম (সা.) সেই বিবাহ বাতিল ঘোষণা করেন এবং তাঁকে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। এই ঘটনা ইসলামে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানসিক অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ।

আজীবন সামাজিক নিরাপত্তা ও পুনঃআশ্রয়ের অধিকার

ইসলামি সমাজব্যবস্থায় একজন বোন কখনো নিঃস্ব বা অভিভাবকহীন নয়। বিয়ের পরও তার পিতৃপরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। যদি কোনো বোন তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা কিংবা আর্থিকভাবে অসহায় হয়ে পড়ে, তবে পুনরায় তার আশ্রয় ও ভরণপোষণের দায়িত্ব ভাইদের ওপর বর্তায়।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ؟ ابْنَتُكَ أَوْ أُخْتُكَ مَرْدُودَةً إِلَيْكَ، لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ»
অনুবাদ: সুরাকা ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) বলেছেন: “আমি কি তোমাকে সর্বোত্তম সদকার কথা জানাব না? সেই কন্যা বা বোন, যে বিপদগ্রস্ত হয়ে তোমার কাছে ফিরে এসেছে এবং তুমি ছাড়া তার আর কোনো উপার্জনকারী নেই।”__(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৩৬৬৭)

রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেও তাঁর দুধ-বোন শায়মা (রা.)-এর প্রতি অসাধারণ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। হুনায়নের যুদ্ধের পর শায়মা (রা.) বন্দি হিসেবে এলে রাসুল (সা.) নিজের চাদর বিছিয়ে তাঁকে বসার ব্যবস্থা করেন এবং অত্যন্ত সম্মান ও ভালোবাসার সঙ্গে তাঁর খোঁজখবর নেন। পরবর্তীতে তাঁকে উপহারসহ সম্মানজনকভাবে বিদায় দেন। এ ঘটনা ইসলামে বোনের সামাজিক মর্যাদা ও মানবিক অধিকারের এক অনন্য উদাহরণ।

পারিবারিক উপহার ও ভালোবাসায় সমতা পাওয়ার অধিকার

পারিবারিক শান্তি ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ইসলাম সন্তানদের মধ্যে সমতা বজায় রাখাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। ভাইদের বেশি মূল্যায়ন করে বোনদের অবহেলা করা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ»

অনুবাদ: নুমান ইবনে বাশির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখো।"__(সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৫৮৭)

এই হাদিসের মাধ্যমে ইসলাম পরিবারে মানসিক ভারসাম্য ও সৌহার্দ্য বজায় রাখতে চেয়েছে। কারণ উপহার, ভালোবাসা ও আচরণে বৈষম্য পারিবারিক হিংসা, কষ্ট ও দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারে। তাই বোন যেন কখনো নিজেকে অবহেলিত বা কম মূল্যবান মনে না করে— ইসলাম সে বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন।

সম্মান, সামাজিক সুরক্ষা ও অপবাদ থেকে নিরাপত্তার অধিকার

একজন বোনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো তার সম্মান ও আত্মমর্যাদা। ইসলাম সমাজে নারীর ইজ্জত ও মর্যাদাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। কোনো বোনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ, গিবত বা কুৎসা রটানো হলে তার ভাই ও পরিবারকে তার পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

অনুবাদ: "যে ব্যক্তি তার ভাই বা বোনের অনুপস্থিতিতে তার সম্মান রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।"__(সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ১৯৩১)

ইফকের ঘটনায় যখন হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়ানো হয়েছিল, তখন সত্যনিষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম দৃঢ়ভাবে সেই অপবাদের প্রতিবাদ করেছিলেন। বিশেষত হযরত আবু আইউব আনসারি (রা.) ও তাঁর স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বলেন— "এটি সুস্পষ্ট মিথ্যা।" এই ঘটনা প্রমাণ করে, একজন মুসলিমের দায়িত্ব হলো নারীর সম্মান রক্ষায় দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা।

ইসলাম বোনকে কেবল পারিবারিক সদস্য হিসেবে নয়; বরং মর্যাদাসম্পন্ন একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করেছে। শিক্ষা, বিবাহ, সামাজিক নিরাপত্তা, মানসিক মর্যাদা, ভালোবাসা, সম্মান ও মানবিক সহযোগিতার প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম বোনের অধিকারকে সুস্পষ্টভাবে সংরক্ষণ করেছে। প্রকৃত ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে কোনো বোন অবহেলিত, নিরাপত্তাহীন বা অসম্মানিত থাকবে না; বরং সে পরিবার ও সমাজে সম্মান, মর্যাদা ও ভালোবাসার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারবে।

- **5.ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights of Women)**

ইসলাম কেবল নারীকে ঘরের ভেতরেই আবদ্ধ রাখেনি, বরং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ, সামাজিক সংস্কার এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মতামত ও সক্রিয় অংশগ্রহণের পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। সমকালীন গবেষকদের আলোকে ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকারসমূহ নিচে শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক দলিলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

ইসলামি শাসনব্যবস্থায় 'শুরা' বা পরামর্শ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক স্তম্ভ। রাষ্ট্রের সংকটময় মুহূর্তে যোগ্য ও প্রজ্ঞাবান নারীর রাজনৈতিক পরামর্শ গ্রহণ করার বিধান ইসলামে রয়েছে।
হুদায়বিয়ার সন্ধির চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের কুরবানি করার ও মাথা মুণ্ডন করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু চুক্তির শর্তাবলি সাহাবিদের মনঃপূত না

হওয়ায় তাঁরা চরম হতাশা থেকে চুপ করে রইলেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর তাঁবুতে গিয়ে স্ত্রী উম্মে সালামা (রা.)-এর সাথে এই রাজনৈতিক সংকট নিয়ে পরামর্শ করলেন। উম্মে সালামা (রা.) তখন একটি দূরদর্শী রাজনৈতিক পরামর্শ দিয়ে বললেন__

«يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ»

অনুবাদ: "হে আল্লাহর নবী! আপনি যদি এটিই পছন্দ করেন, তবে আপনি বাইরে যান এবং তাঁদের কারও সাথে কোনো কথা না বলে নিজে আপনার কুরবানির পশুটি জবেহ করুন এবং আপনার নাপিতকে ডাকুন, সে যেন আপনার মাথা মুণ্ডন করে দেয়।" (উৎস: সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ২৭৩২)

রাসুলুল্লাহ (সা.) উম্মে সালামা (রা.)-এর এই রাজনৈতিক কৌশলটি গ্রহণ করে বাইরে গিয়ে নিজেই কুরবানি ও মাথা মুণ্ডন করলেন। এটি দেখে সাহাবিরাও দ্রুত তাঁর অনুকরণ করলেন এবং একটি বড় ধরনের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের হাত থেকে মদিনা রাষ্ট্র রক্ষা পেল। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিক সংকট নিরসনে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা পরামর্শ দেওয়ার অধিকার ইসলামে স্বীকৃত।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'বায়াত' ছিল এক ধরনের রাজনৈতিক চুক্তি বা আনুগত্য প্রকাশ, যা আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ‘ভোট’ বা রাজনৈতিক সমর্থনের সমতুল্য। ইসলাম পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও এই রাজনৈতিক অধিকার দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন__

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অনুবাদ: "হে নবী! মোমিন নারীরা যখন আপনার কাছে এসে এই মর্মে বায়াত (রাজনৈতিক ও আদর্শিক আনুগত্যের শপথ) করতে চায় যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো শরিক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, সজ্ঞানে কোনো অপবাদ রটনা করবে না এবং সৎকাজে আপনার

অবাধ্য হবে না, তখন আপনি তাদের বায়াত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সুরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ১২)

মক্কা বিজয়ের পর এবং আকাবার শপথের সময় পুরুষদের মতোই নারীরাও স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে এসে রাজনৈতিক সমর্থন ও বায়াত দিয়েছিলেন। কুরআনের এই নির্দেশনাটি স্পষ্ট করে যে, একটি আদর্শিক ও রাজনৈতিক সমাজ গঠনে নারীর নিজস্ব মতামত বা 'ভোট' দেওয়ার স্বাধীনতা ইসলামি আইনের অংশ।

যোগ্যতার ভিত্তিতে নারীরা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও তদারকি মূলক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.)-এর শাসন আমলে এর বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায়।

ইসলামি ইতিহাসের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-ইসাবাহ' সহ বিভিন্ন জীবনবৃত্তান্ত মূলক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, খলিফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) মদিনার বাজার ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্যিক লেনদেন পর্যবেক্ষণ এবং বাজার আদালতের পরিদর্শক (Market Inspector) হিসেবে 'শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ' (রা.) নামের একজন বিদুষী ও যোগ্য নারীকে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَّى الشِّفَاءَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ أَمْرَ السُّوقِ»

অনুবাদ: "নিশ্চয়ই ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ-কে মদিনার বাজার পরিদর্শনের দায়িত্ব (প্রশাসনিক পদ) অর্পণ করেছিলেন।" (ইবনে হাজার আসকালানি, আল-ইসাবাহ ফি তাময়িজিস সাহাবাহ, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৭২৭)

এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, নারীরা কেবল পারিবারিক জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন। সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যদি কোনো নারী যোগ্য হন, তবে তাকে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বৈধ।

ইসলামে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসক বা খলিফাকেও প্রশ্ন করার এবং তাঁর ভুল পলিসির সমালোচনা করার অধিকার একজন সাধারণ নারীকে দেওয়া হয়েছে।

খলিফা হযরত ওমর (রা.) যখন মদিনার মসজিদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন যে, সমাজে বিয়ের মোহরানার পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে, তাই কেউ যেন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি মোহরানা ধার্য না করে। তখন পেছনের কাতার থেকে একজন সাধারণ নারী দাঁড়িয়ে খলিফার এই রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলেন এবং সুরা নিসার ২০ নম্বর আয়াতটি তিলাওয়াত করে বললেন, "হে ওমর! আল্লাহ যেখানে আমাদের অঢেল সম্পত্তি মোহরানা হিসেবে দেওয়ার অধিকার দিয়েছেন, সেখানে আপনি তা সীমাবদ্ধ করার কে?" খলিফা ওমর (রা.) তখন নিজের ভুল স্বীকার করে ঐতিহাসিক একটি বাক্য বলেছিলেন:

«أَصَابَتِ امْرَأَةٌ وَأَخْطَأَ عُمَرُ»

অনুবাদ: "নারীটি সঠিক বলেছে, আর ওমর ভুল করেছে।" (আল-জাসসাস, আহকামুল কুরআন, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৯৪)

এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, ইসলামে বাকস্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ অধিকার রয়েছে। একজন সাধারণ নারীও রাষ্ট্রের প্রধান আইনপ্রণেতা বা খলিফার সিদ্ধান্তের ভুল ধরে শরিয়তের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারেন।

ইসলামের ইতিহাসে নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে সেবামূলক কাজ, আহতদের চিকিৎসা, পানি সরবরাহ এবং প্রয়োজনে প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করেছেন।

নুসাইবা বিনতে কা'ব উহুদের যুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে নবী ﷺ-কে রক্ষা করেছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে, প্রয়োজনে নারী রাষ্ট্র ও সমাজ রক্ষার কাজেও অংশ নিতে পারে।

ইসলাম নারীর রাজনৈতিক অধিকারকে অস্বীকার করেনি; বরং তাকে মর্যাদা ও দায়িত্বের সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে। মত প্রকাশ, পরামর্শ প্রদান, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, শাসক নির্বাচন, সামাজিক নেতৃত্ব ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অংশ। তবে ইসলাম এ অধিকার পালনের ক্ষেত্রে শালীনতা, নৈতিকতা ও ইসলামী আদর্শ বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এভাবেই ইসলাম নারীকে সম্মান, মর্যাদা ও দায়িত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থান প্রদান করেছে।

- **6.ইসলামে নারীর নিরাপত্তা লাভের অধিকার**

পর্দা নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তার রক্ষাকবচ

বর্তমান সময়ে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ অভিযোগ হলো—ইসলাম নাকি নারীদের পর্দার আড়ালে বন্দি করে রেখেছে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দা কোনো বন্দিত্ব নয়; বরং এটি নারীর সম্মান, নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। পর্দার মাধ্যমে নারী নিজেকে অশ্লীলতা, কটূক্তি ও অনাকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টি থেকে সুরক্ষিত রাখে। ইসলাম নারীকে সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তার সঙ্গে জীবনযাপনের অধিকার দিয়েছে। জাহেলি যুগে নারীরা ছিল অবহেলিত, নির্যাতিত ও নিরাপত্তাহীন। তাদের ছিল না সম্মান, সম্ভ্রম ও সামাজিক মর্যাদার কোনো মূল্য। ইসলাম এসে নারীর জীবন, ইজ্জত, সম্ভ্রম ও ব্যক্তিত্বকে সুরক্ষিত করেছে এবং তাকে একটি সম্মানিত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী কোনো ভোগ্যপণ্য নয়; বরং সে পরিবার ও সমাজের মর্যাদাপূর্ণ সদস্য।

ইসলাম নারীর নিরাপত্তাকে শুধু নারীর দায়িত্ব হিসেবে দেখেনি; বরং পুরুষ ও সমাজ উভয়ের ওপরই এ দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এজন্য ইসলাম পবিত্র কোরআনে সর্বপ্রথম পুরুষদের দৃষ্টি সংযত করার নির্দেশ দিয়েছে।তারপর নারীদের কথা উল্লেখ করেছেন।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।”— (সূরা আন-নূর, ২৪:৩০)

এরপর আল্লাহ তাআলা নারীদের উদ্দেশ্যে বলেন—

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَ ايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ছাড়া নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।”— (সূরা আন-নূর, ২৪:৩১)
এ আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলাম নারীকে অসম্মান বা দোষারোপ করেনি; বরং নারী-পুরুষ উভয়কেই পবিত্র ও নিরাপদ সমাজ গঠনের দায়িত্ব দিয়েছে।

ইসলাম নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পর্দার বিধান প্রদান করেছে। বর্তমান সময়ে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ অভিযোগ হলো—ইসলাম নাকি নারীদের পর্দার আড়ালে বন্দি করে রেখেছে। অথচ বাস্তবতা হলো, পর্দা কোনো বন্দিত্ব নয়; বরং এটি নারীর সম্মান, নিরাপত্তা ও মর্যাদার রক্ষাকবচ। পর্দা নারীর স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার জন্য নয়; বরং তাকে অশ্লীলতা, কটূক্তি, কুদৃষ্টি ও সামাজিক অনিরাপত্তা থেকে রক্ষা করার জন্য।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের ওপর তাদের চাদরের কিছু অংশ টেনে দেয়। এতে তাদেরকে সহজে চেনা যাবে এবং তারা নির্যাতিত হবে না। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।”— (সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৫৯)

এ আয়াতে ও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, পর্দার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নারীদের হয়রানি ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করা। নারী যখন পর্দা ও শালীনতা বজায় রেখে সমাজে চলাফেরা করে, তখন তাকে ভোগের বস্তু হিসেবে নয়; বরং সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে দেখা হয়। একইসঙ্গে পুরুষ সমাজও সংযমী হয় এবং সমাজে নৈতিকতা ও পবিত্রতা বজায় থাকে।

ইসলামে নারীর নিরাপত্তা ও সম্ভ্রম রক্ষা করা যে আল্লাহ প্রদত্ত একটি পরম অধিকার, তা মদীনার 'বনু কাইনুকা' গোত্রের ঐতিহাসিক ঘটনা দিকে তাকালে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। মদীনার বাজারে যখন এক ইহুদি স্বর্ণকার একজন মুসলিম নারীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে, তখন তার সম্মান রক্ষার্থে একজন মুসলিম ভাই এগিয়ে আসেন এবং স্বর্ণকারকে আঘাত করেন। পরবর্তীতে ইহুদিরা সেই মুসলিম ভাইটিকে শহীদ করে ফেলে। একজন নারীর সম্ভ্রমহানি ও মুসলিম হত্যার এই খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরো বনু কাইনুকা গোত্রকে চুক্তি ভঙ্গের অপরাধে অবরোধ করেন এবং তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, ইসলামে নারীর ইজ্জতের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে পুরো রাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে।

এছাড়াও সমাজে নারীর এই সুরক্ষার পাশাপাশি, পথঘাট ও দীর্ঘ ভ্রমণে তারা যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে ও নিরাপদে চলাচল করতে পারেন, সেই নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করাকেও ইসলাম নিশ্চিত করেছে। এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

«فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ»

"যদি তুমি দীর্ঘজীবী হও, তবে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, একজন নারী হীরাহ (ইরাকের একটি অঞ্চল) থেকে একাকী উটে সওয়ার হয়ে এসে কাবা শরীফ তওয়াফ করবে, অথচ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই সে ভয় পাবে না।" — (সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৩৫৯৫)

এই হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা.) নিজেই বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, তখন আরবের পথঘাট ডাকাতদের কারণে চরম অনিরাপদ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পর, তিনি নিজের চোখে দেখেন যে একজন নারী কোনো রকম ভয়ভীতি ছাড়াই ইরাক থেকে মক্কায় এসে একা একা কাবা শরীফ তওয়াফ করছে। ইতিহাসের এই বাস্তব ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম কেবল মুখে নারীর নিরাপত্তার কথা বলেনি, বরং সমাজে তা বাস্তবে রূপ দিয়ে দেখিয়েছে।

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের সম্মান ও নিরাপত্তার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। এ ব্যাপারে বিদায় হজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ

“তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।” — (সহিহ মুসলিম)

বর্তমান সমাজে নারীরা বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানি, কটূক্তি, ধর্ষণ ও অনিরাপত্তার শিকার হচ্ছে। অথচ ইসলাম বহু পূর্বেই নারীকে সম্মান ও নিরাপত্তার সঙ্গে সমাজে চলার বাস্তবসম্মত নীতিমালা প্রদান করেছে। ইসলাম নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, জুলুম, কটূক্তি ও অপবাদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। কোনো নারীর সম্মানহানি বা চরিত্রহননকে ইসলাম গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে। তাই বলা যায়, ইসলামে নারীর নিরাপত্তা লাভের অধিকার একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইসলাম নারীকে এমন একটি জীবনব্যবস্থা দিয়েছে, যেখানে তার সম্মান, সম্ভ্রম, পবিত্রতা ও নিরাপত্তা সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে সংরক্ষিত হয়।

- **7.ইসলামে নারীর আইনানুগ অধিকার**

ইসলামী শরিয়ত নারী ও পুরুষ উভয়ের জীবন, সম্পদ, সম্মান ও ন্যায়বিচারের অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ করেছে। ইসলাম নারীকে কেবল পারিবারিক মর্যাদাই দেয়নি; বরং আইনগতভাবেও তাকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা ও পূর্ণ অধিকারসম্পন্ন মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। জাহেলি যুগে যেখানে নারীদের অবজ্ঞা করা হতো, সেখানে ইসলাম এসে নারীর জান-মাল, ইজ্জত, সাক্ষ্য, বিচার ও সামাজিক মর্যাদাকে আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত করেছে।

হত্যার ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের অধিকার

ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ উভয়েই ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সমন।যদি কোনো পুরুষ কোনো নারীকে হত্যা করে তাহলে সে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে, আর তা হলো সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন__

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

“হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কিসাস বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।”— (সূরা আল-বাকারা, ২:১৭৮)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾

“হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা! কিসাসের মধ্যেই তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে।”— (সূরা আল-বাকারা, ২:১৭৯)

ইসলামী আইনে হত্যার অপরাধে নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই কিসাসের বিধান কার্যকর হয়। একইভাবে আহত করা বা অঙ্গহানির ক্ষেত্রেও শরিয়ত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে।

এ ব্যাপারে ও পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন__وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ

“চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান।”— (সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৪৫)

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি আইন অনুসারে নারী পুরুষের 'কিসাস' সমভাবে চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দেহের বদলে দেহ উভয়ে সমান শাস্তি পাবে। এমনকি যদি মৃতের অভিভাবক নারী হয় এবং বলে যে, হত্যাকারীকে মাফ করে 'দিয়াত' অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ কর- তার মতকেও বাতিল করা যাবে না।তাদেরকে এটা গ্রহণ করতে হবে। যদি নিহতের আত্মীয়ের মধ্যে মতানৈক্য হয়, কেউ বলে হত্যাকারীকে হত্যা করাই উচিত, কেউ বলে 'দিয়াত' গ্রহণ করে তাকে মাফ করে দেয়া উচিত, তাহলে লোকদের হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া থেকে ফিরিয়ে রাখা উচিত। সমভাবে নারী-পুরুষ যেই মতামত দিক না কেনো তার গুরুত্ব একই।

চুরির শাস্তিতে সমতা

ইসলামে চুরি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। নারী বা পুরুষ—যেই এ অপরাধে লিপ্ত হোক না কেন, শরিয়তের বিধান উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন__

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾

“চোর পুরুষ ও চোর নারী—তাদের হাত কেটে দাও; এটি তাদের কৃতকর্মের শাস্তি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক বিধান।”— (সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৩৮)

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসলামী আইন অপরাধের বিচারে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য করে না; বরং উভয়ের জন্য সমানভাবে বিচার নিশ্চিত করে।অর্থাৎ নারী পুরুষ যেই চুরি করুক তার হাত কাটা হবে, উভয়ের জন্য শাস্তি একই।

ব্যভিচারের শাস্তিতে সমান বিধান

ইসলাম সমাজের পবিত্রতা ও নৈতিকতা রক্ষার জন্য ব্যভিচারকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এ অপরাধের ক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য একই শাস্তির বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন__ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ—তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করো।”— (সূরা আন-নূর, ২৪:২)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামে ব্যভিচারের দায় কেবল নারীর ওপর চাপানো হয়নি; বরং নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং উভয়ের জন্য একই শাস্তি অর্থাৎ ১০০ দোররা নির্ধারণ করা হয়েছে।উভয়ের অপরাধকেই এখানে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিবেচনা করা হয়েছে। নারীর ওপর কোনোরূপ বাড়তি প্রেসার দেয়া হয়নি।

নারীর সম্মান ও সাক্ষ্যদানের অধিকার

ইসলাম নারীর সম্মান ও মর্যাদাকে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করেছে।ইসলামে মহিলাদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। ইসলাম একজন নারীকে ১৪০০ বছর পূর্বে সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকার প্রদান করেছে। কোনো সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করাকে ইসলাম গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾

“যারা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদের আশি বেত্রাঘাত করো।”— (সূরা আন-নূর, ২৪:৪)

এ আয়াত নারীর সম্মান রক্ষায় ইসলামের কঠোর অবস্থানকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। ইসলাম নারীদের সাক্ষ্যদানের অধিকারও প্রদান করেছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে শরিয়ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে নারীর সাক্ষ্যকে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।
ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ছোট অপরাধের জন্য দুই জন সাক্ষী এবং বড় অপরাধের ক্ষেত্রে চার জন সাক্ষী প্রয়োজন হয়। যে কোনো নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া ইসলামে বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। অতএব এরূপ অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে চার জন সাক্ষীর প্রয়োজন হবে। আধুনিক সমাজে এসে ও দেখা যায় পুরুষ নারীকে অপবাদ দিচ্ছে, তাদেরকে বাজে ধরনের গালাগাল দিচ্ছে, তাদেরকে বেশ্যা আখ্যা দিচ্ছে, কিন্তু এ ব্যাপারে নারীর তেমন কিছুই করার নেই।
অথচ ইসলামি রাষ্ট্রে কেউ যদি জনসমক্ষে অথবা অন্য কোথাও নারীকে বেশ্যা বলে, এ জন্য সে যদি পুরুষকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়, তাহলে চার জন সাক্ষী হাজির করতে হবে। সে যদি চার জন সাক্ষী আনে এবং তাদের একজনও দ্বিধান্বিত হয় তাহলে এ সাক্ষ্যদাতাদের সকলকে ৮০ দোররা মারা হবে। ভবিষ্যতে তাদের সকলের সাক্ষ্যও অগ্রহণযোগ্য। এভাবেই ইসলাম নারীদের সতীত্বের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। এটি নারীর আইনগত মর্যাদার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

স্বতন্ত্র পরিচয়ের অধিকার

ইসলাম নারীকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার অধিকার দিয়েছে। বিবাহের পরও একজন নারী তার পারিবারিক পরিচয় ও নাম বহাল রাখতে পারে। ইসলাম নারীর নিজস্ব পরিচয়কে সম্মান করেছে এবং তাকে স্বামীর পরিচয়ের মধ্যে বিলীন করে দেয়নি। এ বিধান নারীর ব্যক্তিগত মর্যাদা ও স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতির বহিঃপ্রকাশ।

সর্বোপরি বলা যায়, ইসলামী শরিয়ত নারীর জীবন, সম্পদ, সম্মান ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ আইনগত মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলামের আইন নারীকে অবহেলা বা বঞ্চিত করেনি; বরং তাকে ন্যায়, নিরাপত্তা ও সম্মানের সঙ্গে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামে নারীর অধিকার বনাম নারীবাদ এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ

১. ইসলাম ও নারীবাদের মৌলিক দ্বান্দ্বিকতা: সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ও ইসলামের অগ্রগামিতা

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার:

পশ্চিমা নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ (First-wave feminism) যখন উনবিংশ শতাব্দীতে এসে নারীর মৌলিক সম্পত্তির অধিকার বা ভোটাধিকারের জন্য লড়াই শুরু করে, ইসলাম তার ঠিক চৌদ্দশত বছর আগেই এই অধিকারগুলো ঐশ্বরিক আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। উদাহরণস্বরূপ, খোদ যুক্তরাজ্যে ১৮৭০ সালের আগে বিবাহিত নারীর নিজস্ব কোনো সম্পত্তির আইনি অধিকার ছিল না; বিয়ের পর নারীর সব সম্পত্তি স্বামীর হয়ে যেত।

অথচ ইসলাম ৭ম শতাব্দী থেকেই নারীকে সম্পূর্ণ স্বাধীন অর্থনৈতিক সত্তা দিয়েছে। সূরা নিসার ৩২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: "পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।" ইসলামে বিয়ের পর নারীর বংশীয় নাম বা স্বতন্ত্র পরিচয় পরিবর্তনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, যা তার চিরন্তন সামাজিক ও আইনি অস্তিত্বের বড় প্রমাণ। আমাদের সমাজে পৈতৃক সম্পত্তি বন্টনের সময় বোনদের বঞ্চিত করার যে পুরুষতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা যায়, তা ইসলামের ত্রুটি নয়, বরং তা এদেশীয় অমুসলিম সংস্কৃতির অন্ধ প্রভাব এবং ইসলামের আইন না মানার বহিঃপ্রকাশ। ইসলামে উত্তরাধিকারের আইন (সূরা নিসা, আয়াত: ১১) এতটাই অলঙ্ঘনীয় যে, একজন নারী তার বাবার বাড়ি এবং স্বামীর বাড়ি—উভয় জায়গা থেকেই আইনিভাবে সম্পত্তির অংশীদার হন, যা পশ্চিমা আইন আধুনিক যুগে এসে নিশ্চিত করেছে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও শিক্ষার সমান অধিকার:

নারীবাদের অন্যতম প্রধান দাবি হলো কন্যাসন্তান বা নারীর ওপর সামাজিক জুলুম, নির্যাতন এবং বৈষম্যের অবসান ঘটানো। ইসলাম আরবের অন্ধকার যুগে (আইয়ামে জাহেলিয়াত) কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো চরম নৃশংস প্রথার প্রাতিষ্ঠানিক মূলোৎপাটন করেছে। কুরআন এই লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের তীব্র নিন্দা করে সূরা তাকভীরের ৮-৯ নম্বর আয়াতে জিজ্ঞেস করেছে: "যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?" শুধু সুরক্ষাই নয়, ইসলামে জ্ঞান অর্জনকে কোনো লিঙ্গভিত্তিক সীমানায় আটকে রাখা হয়নি।
হাদিসে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে: "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর-নারী) জন্য ফরজ।" ইসলামের ইতিহাসে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন সমসাময়িক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ, চিকিৎসাবিদ এবং হাদিস বিশারদ, যা প্রমাণ করে ইসলাম নারীকে সর্বোচ্চ একাডেমিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উচ্চতায় পৌঁছানোর পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। একই সাথে, বৈবাহিক সম্মতির ক্ষেত্রে নারীর অনুমতি ছাড়া বিয়ে সম্পূর্ণ বাতিল বা অবৈধ এবং বিয়েতে 'মোহরানা' বা দেনমোহরের বিধান রাখা হয়েছে, যা নারীর সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থনৈতিক অধিকার (সূরা নিসা, আয়াত: ৪)।

মৌলিক বৈসাদৃশ্য—পরম স্বাধীনতা বনাম আল্লাহর দাসত্ব ও পরিপূরকতা:
সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ইসলাম ও নারীবাদের উৎস, লক্ষ্য এবং দর্শনে রয়েছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। পশ্চিমা নারীবাদের মূল চালিকাশক্তি হলো ‘উদারনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ’ (Liberal Individualism), যার স্লোগান হলো "My Body, My Choice" (আমার শরীর, আমার সিদ্ধান্ত)। এখানে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাই শেষ কথা। কিন্তু ইসলামের মূল দর্শন হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও দাসত্ব (Submission to Allah)। মানুষ নিজের শরীরের পরম মালিক নয়, বরং সে আল্লাহর আমানতদার। নারীবাদের লক্ষ্য হলো ইহজাগতিক ও বস্তুবাদী স্বাধীনতা; আর ইসলামের লক্ষ্য হলো ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তি। নারীবাদ অন্ধ জেন্ডার সমতার (Gender Equality) দাবি তোলে, যা নারী ও পুরুষকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হুবহু এক করতে চায়, যা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে জেন্ডার ন্যায্যতা বা জাস্টিস (Gender Equity), যেখানে উভয়ের শারীরিক, জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক গঠন বিবেচনা করে ভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু মর্যাদায় তারা সমান। কুরআন ঘোষণা করে: "তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক" (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭)।

পোশাক যেভাবে মানুষের নগ্নতা ঢেকে রাখে, তীব্র আবহাওয়া থেকে সুরক্ষা দেয় এবং সৌন্দর্য বাড়ায়, পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকাও ঠিক তেমন পরিপূরক। নারীবাদ যেখানে পরিবারকে একটি শোষণের ক্ষেত্র এবং পুরুষকে আজন্ম শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করে সমাজকে যুদ্ধক্ষেত্রে রূপ দেয়, ইসলাম সেখানে পরিবারকে একটি নিরাপদ ও শান্তিময় দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলে।

ঘরে বন্দি রাখা ও চাকরি করার অধিকার নিয়ে কটাক্ষ: নারীবাদীদের একটি বড় অভিযোগ হলো, ইসলাম নারীকে ঘরে বন্দি রেখে তার ক্যারিয়ার ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। কিন্তু ইসলামের মূল আইন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইসলাম নারীকে ঘর থেকে বের হতে বা হালাল উপায়ে চাকরি ও ব্যবসা করতে কখনোই নিষেধ করেনি। বৈসাদৃশ্য হলো—নারীবাদ নারীকে নিজের অন্ন-বস্ত্রের জন্য বাইরে গিয়ে খাটতে বাধ্য করে; আর ইসলাম নারীর ওপর থেকে উপার্জনের এই মানসিক ও শারীরিক বোঝা সম্পূর্ণ তুলে নিয়েছে। ইসলাম বলে, নারীর উপার্জনের টাকা সম্পূর্ণ তার নিজের ব্যক্তিগত সঞ্চয় (সূরা নিসা, আয়াত: ৩২)। সে যদি চাকরি বা ব্যবসা করে কোটি টাকাও আয় করে, সংসারের এক টাকাও খরচ করতে সে বাধ্য নয়। সংসারের সম্পূর্ণ খরচ দেওয়া স্বামীর আইনি বাধ্যবাধকতা। ফলে, ইসলাম নারীকে বন্দি করেনি, বরং অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে ঘরের 'রানি'র আসনে বসিয়েছে।

উত্তরাধিকারের সম্পত্তিতে বৈষম্যের অভিযোগ: নারীবাদীরা সবচেয়ে বেশি কটাক্ষ করে যে, ইসলামে পৈতৃক সম্পত্তিতে কেন ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ পাবে? আপাতদৃষ্টিতে একে বৈষম্য মনে হলেও বাস্তব খরচের হিসাবে এটি নারীর জন্য চরম লাভজনক এবং পুরুষের জন্য বড় বোঝা। উদাহরণস্বরূপ: ধরুন, একজন বাবা মারা যাওয়ার পর ১ লক্ষ টাকা রেখে গেলেন। ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী, বোন পেলেন প্রায় ৩৩,৩৩৩ টাকা এবং ভাই পেলেন ৬৬,৬৬৭ টাকা। আপাতদৃষ্টিতে ভাইকে বেশি মনে হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব হিসাবটা দেখুন—বোন এই ৩৩,৩৩৩ টাকা সম্পূর্ণ নিজের অ্যাকাউন্টে জমিয়ে রাখবেন, এখান থেকে তার নিজের এক টাকার খরচও করতে হবে না। কারণ তার বিয়ের আগে বাবা বা ভাই এবং বিয়ের পর স্বামী তার অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের সব খরচ দিতে বাধ্য। অন্যদিকে, ভাই যে ৬৬,৬৬৭ টাকা পেলেন, তা থেকে তাকে নিজের খরচ চালাতে হবে, নিজের স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে হবে, সন্তানদের পড়াশোনার

খরচ দিতে হবে এবং বোন বা মায়ের দেখভাল করতে হবে। দিনশেষে দেখা যাবে, ভাইয়ের পকেটের ৬৬,৬৬৭ টাকা খরচ হয়ে শূন্য হয়ে গেছে, অথচ বোনের ৩৩,৩৩৩ টাকা ব্যাংকে একদম সুরক্ষিত রয়ে গেছে। একেই বলে ঐশ্বরিক জেন্ডার ন্যায্যতা (Gender Equity)।

বহুবিবাহের (Polygamy) অবমাননাকর কটাক্ষ: নারীবাদীরা বহুবিবাহের আইনকে পুরুষতান্ত্রিক লালসার প্রতীক হিসেবে কটাক্ষ করে। কিন্তু ইসলাম সামাজিক ভারসাম্য ও নারীর নিরাপত্তার স্বার্থেই বিশেষ পরিস্থিতিতে শর্তসাপেক্ষে এর অনুমতি দিয়েছে (সূরা নিসা, আয়াত: ৩)। যুদ্ধবিগ্রহ বা কোনো সংকটের কারণে সমাজে যখন পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যায়, তখন নারীবাদী সমাজ নারীকে লিভ-ইন রিলেশন বা অবৈধ উপপত্নী বানিয়ে তার সামাজিক ও আইনি অধিকার কেড়ে নেয়। কিন্তু ইসলাম বহুবিবাহের মাধ্যমে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্ত্রীকে প্রথম স্ত্রীর মতোই সমান আইনি সামাজিক মর্যাদা, সন্তানদের পিতৃপরিচয় এবং সম্পত্তির সমান অধিকার দেয়, যা নারীর অধিকার ও সুরক্ষার এক অনন্য হাতিয়ার।

আদালতের সাক্ষ্য এবং যোগ্যতার প্রশ্ন: দুইজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান—এই আইনটিকে নারীবাদীরা নারীর বুদ্ধিমত্তার অবমাননা বলে প্রচার করে। অথচ এটি কেবল জটিল অর্থনৈতিক বা আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮২)। ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক চাপ থেকে মুক্ত রেখেছে, তাই আর্থিক হিসাব-নিকাশে ভুল হওয়া বা চাপের মুখে পড়া স্বাভাবিক। আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, একজন ভুলে গেলে যেন অন্যজন মনে করিয়ে দিতে পারে। এটি কোনো যোগ্যতার অবমাননা নয়, বরং জটিল আইনি প্রক্রিয়ায় নারীকে এক ধরণের মনস্তাত্ত্বিক স্বস্তি ও ব্যাকআপ দেওয়ার আইনি সুরক্ষাকবচ মাত্র।

২. আধুনিক নারীবাদের সমালোচনা: ফিতরাত ও পুঁজিবাদের ফাঁদ

ক) জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক ফিতরাত (প্রকৃতি) অস্বীকার এবং এর বৈজ্ঞানিক অসারতা: আধুনিক উগ্র নারীবাদ দাবি করে যে, নারী ও পুরুষের মানসিক, আচরণগত বা সামাজিক ভূমিকাগুলো সৃষ্টিগত কোনো বিষয় নয়, বরং সমাজ ও সংস্কৃতি জোর করে

মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, যাকে তারা 'Social Construct' বলে। কিন্তু এই দাবি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং জিনতত্ত্বের (Genetics) সম্পূর্ণ বিরোধী। মানুষের ক্রোমোজোমাল গঠন (XX বা XY) এবং হরমোনের ভিন্নতা (টেস্টোস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন) কোষীয় স্তর থেকেই নারী ও পুরুষকে ভিন্নভাবে তৈরি করে। নিউরোসায়েন্সের গবেষণা প্রমাণ করে যে, পুরুষ ও নারীর মস্তিষ্কের গঠন এবং কার্যপদ্ধতি (Brain Wiring) এক নয়। নারীদের মস্তিষ্ক এবং হরমোনাল সাইকেল (যেমন প্রসব ও মাতৃত্বকালীন হরমোন অক্সিটোসিন) তাদের সহজাতভাবেই অধিক সহানুভূতিশীল, যত্নশীল এবং আবেগগতভাবে প্রকাশপ্রবণ করে গড়ে তোলে। নারীবাদ জেন্ডার-নিউট্রাল বা লিঙ্গহীন সমাজ তৈরি করতে গিয়ে নারীর এই মাতৃত্ব ও কোমলতাকে ‘দুর্বলতা’ বা ‘শৃঙ্খল’ হিসেবে প্রচার করে, যা নারীর ওপর এক ধরণের মনস্তাত্ত্বিক ও জৈবিক জুলুম। প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই অন্ধ যুদ্ধ সমাজকে আজ চরম মানসিক ভারসাম্যের অভাবের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

খ) পুঁজিবাদের দাসত্ব এবং মুক্তির নামে নারীর পণ্যকরণ:

মুক্তির ছদ্মবেশে আধুনিক নারীবাদ আসলে নারীকে মুক্তবাজার অর্থনীতির সবচেয়ে বড় পণ্যে পরিণত করার একটি কর্পোরেট বা পুঁজিবাদী নীলনকশা। শিল্প বিপ্লবের পর পশ্চিমা পুঁজিপতিরা বুঝতে পেরেছিল যে, অর্ধেক জনগোষ্ঠী অর্থাৎ নারীকে যদি ঘর থেকে বের করে কারখানায় না আনা যায়, তবে শ্রমের মজুরি সস্তা করা যাবে না, রাষ্ট্রের করদাতার সংখ্যা বাড়বে না এবং মুক্তবাজারের ভোক্তা দ্বিগুণ হবে না। নারীবাদ মূলত পুঁজিবাদের এই অর্থনৈতিক এজেন্ডাকেই 'নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি'র মোড়কে বাজারজাত করেছে। এর ফলে নারীকে ঘরের নিরাপদ পরিবেশ থেকে বের করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রলোভন দেখানো হলেও, তাকে মূলত কর্পোরেট জগতের চাকার সাথে শৃঙ্খলিত করা হয়েছে। এর চেয়েও মারাত্মক বিষয় হলো নারীর চরম অবমাননাকর পণ্যকরণ। আজ বহুজাতিক কর্পোরেট দুনিয়ায় সাবান, সিমেন্ট, গাড়ি থেকে শুরু করে পুরুষদের শেভিং ক্রিমের বিজ্ঞাপনেও নারীর শরীরকে গ্ল্যামারাইজড করে প্রদর্শন করা হচ্ছে। নারীবাদ এই উন্মুক্ততাকে ‘বডি পজিটিভিটি’ ও ‘নারীর স্বাধীনতা’ বলে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করে, অথচ এটি মূলত নারীর সম্মান ও শালীনতাকে কর্পোরেট মুনাফার স্বার্থে ফুটপাতে নামিয়ে আনার চরম আধুনিক শোষণের নামান্তর।

গ) পারিবারিক কাঠামো ধ্বংসের প্রাতিষ্ঠানিক প্রোপাগান্ডা (দেশীয় প্রেক্ষাপট):

যখন কোনো সমাজে ব্যক্তিস্বার্থ ও চরম আত্মকেন্দ্রিকতা পারিবারিক ত্যাগের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে, তখন সেই সমাজ ধ্বংস হতে বাধ্য। উগ্র নারীবাদ পরিবার প্রথাকে একটি 'শোষণ কেন্দ্র' বা কারাগার এবং সন্তান লালন-পালনকে ক্যারিয়ারের পথে 'এক বিরাট বাধা' হিসেবে চিত্রায়িত করে। এনজিও এবং পশ্চিমা ফান্ডেড এজেন্ডা চালিত আধুনিক নারীবাদ বর্তমান আমাদের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোতে এই মনস্তত্ত্ব ঢুকিয়ে দিচ্ছে যে—"স্বামীকে চা বানিয়ে দেওয়া বা ঘরের কাজ করা মানেই দাসত্ব"। পুরুষকে সবসময় একজন সম্ভাব্য নিপীড়ক এবং নিজেকে চিরন্তন শিকার (Victim) ভাবার এই উগ্র মনস্তত্ত্বের কারণে সামান্য পারিবারিক মনমালিন্যেই আপস বা ত্যাগের মানসিকতা বিসর্জন দিয়ে সংসার ভেঙে ফেলার প্রবণতা বাড়ছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাম্প্রতিক অফিসিয়াল পরিসংখ্যান এবং জাতীয় দৈনিকগুলোর প্রতিবেদন লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাংলাদেশে বিবাহবিচ্ছেদের (Divorce) হার আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে এবং এর মধ্যে প্রায় ৭০%-৮০% ডিভোর্সের আবেদন করছেন আধুনিক শিক্ষায় দীক্ষিত নারীরা। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার জায়গাটি যখন অধিকারের দেন-দরবারে রূপ নেয়, তখন সমাজ থেকে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি বিদায় নেয়।

৩. পশ্চিমা সভ্যতায় নারীবাদের ধস: সমসাময়িক পরিসংখ্যান ও সামাজিক বিপর্যয়

পশ্চিমা অন্ধ বস্তুবাদ এবং উগ্র স্বাধীনতা যখনই কোনো প্রাকৃতিক নিয়মকে (ফিতরাত) ভেঙে নতুন কোনো মানবঘটিত মতবাদ সমাজ ব্যবস্থার ওপর জোর করে চাপাতে গেছে, সমাজ তখন এক ভয়াবহ আত্মহননের দিকে এগিয়ে গেছে। পশ্চিমা সভ্যতায় নারীবাদের চরম রূপ আজ নারীর মুক্তির বদলে যে তীব্র সামাজিক বিপর্যয়, নিরাপত্তাহীনতা ও নৈতিক অবক্ষয় ডেকে এনেছে, তা সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সমাজতাত্ত্বিক ডেটা এবং বাস্তব পরিসংখ্যান দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

ক) বিবাহবিচ্ছেদ ও পারিবারিক কাঠামোর প্রাতিষ্ঠানিক বিলুপ্তি:

নারীবাদের অতি-আধুনিক ঢেউ পরিবার প্রথাকে একটি 'শৃঙ্খল' এবং বিবাহকে একটি 'পুরুষতান্ত্রিক ফাঁদ' হিসেবে প্রচার করার ফলে পশ্চিমা বিশ্বে আজ বৈবাহিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার হার তলানিতে ঠেকেছে। ইউরোস্ট্যাট (Eurostat) এবং আমেরিকার 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর হেলথ স্ট্যাটিস্টিক্স' (NCHS)-এর সর্বশেষ অফিসিয়াল ডেটা

অনুযায়ী, পশ্চিমা দেশগুলোতে (যেমন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপের অধিকাংশ উন্নত দেশে) বর্তমান বিবাহবিচ্ছেদের (Divorce Rate) গড় হার প্রায় ৪২% থেকে ৫০%। এর চেয়েও সমাজবিজ্ঞানীদের চমকে দেওয়ার মতো তথ্য হলো, এই ডিভোর্সের প্রায় ৭০%-৮০% আবেদন করা হচ্ছে স্বয়ং নারীদের পক্ষ থেকে। পুরুষকে সহযোদ্ধা বা পরিপূরক না ভেবে আজন্ম শত্রু বা প্রতিপক্ষ ভাবার এই উগ্র নারীবাদী মনস্তত্ত্ব সামান্য পারিবারিক বোঝাপড়ার অভাব বা ছোটখাটো ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতাকেও আইনি যুদ্ধক্ষেত্রে রূপ দিচ্ছে, যার চূড়ান্ত মাশুল দিতে হচ্ছে সমাজকে।

খ) একক মাতৃত্ব (Single Motherhood) এবং শিশুর মানসিক বিপর্যয়:

উগ্র নারীবাদ নারীকে পুরুষের সাহায্য ছাড়াই স্বাধীনভাবে একা জীবনযাপনের যে আকাশকুসুম স্লোগান দিয়েছিল, বাস্তব সমাজব্যবস্থায় তা 'একক মাতৃত্ব'-এর এক ভয়াবহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটে রূপ নিয়েছে। ইউএস সেন্সাস ব্যুরো (US Census Bureau)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান প্রায় ১ কোটি ১০ লাখেরও বেশি পরিবার একক পিতা বা মাতা দ্বারা পরিচালিত, যার মধ্যে প্রায় ৮০% ক্ষেত্রে মায়েরা একা সন্তান লালন-পালন করছেন। এই একক মায়েদের সিংহভাগই তীব্র অর্থনৈতিক ও মানসিক চাপের সম্মুখীন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং পশ্চিমা মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে, একক অভিভাবকের কাছে বড় হওয়া সন্তানরা দুই অভিভাবকের (বাবা-মা উভয়ের) সন্তানের তুলনায় অপরাধ প্রবণতা, বিষণ্ণতা (Depression), স্কুল থেকে ঝরে পড়া এবং ড্রাগ আসক্তিতে ৩ থেকে ৪ গুণ বেশি ভোগে। এটি নারীবাদের সেই কাল্পনিক 'স্বাধীনতার' এক নির্মম ও বৈজ্ঞানিক বাস্তব চিত্র।

গ) নারীর ওপর দ্বিগুণ বোঝা (The Second Shift) ও মানসিক অবসাদের মহামারী:

নারীবাদ পশ্চিমা নারীকে ঘর থেকে বের করে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী করলেও তার ঘরের ভেতরের চিরন্তন ও প্রাকৃতিক দায়িত্ব থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারেনি। ফলস্বরূপ, বর্তমান পশ্চিমা নারীকে একাধারে ঘরের বাইরে কর্পোরেট অফিসে পুরুষের সমান ৮-১০ ঘণ্টা কায়িক বা মানসিক শ্রম দিতে হচ্ছে, আবার ঘরে ফিরে রান্না, সন্তান লালন-পালন ও গৃহস্থালি কাজও একাই সামলাতে হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানীরা আধুনিক পশ্চিমা নারীর এই যন্ত্রণাময় বাস্তবতাকে বলছেন "The Second Shift" বা দ্বিগুণ কর্মঘণ্টার

বোঝা। আমেরিকার 'সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন' (APA)-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিমা নারীদের মধ্যে এন্টি-ডিপ্রেসেন্ট (Anti-depressant) বা মানসিক অবসাদের ওষুধ সেবনের হার পুরুষদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। মুক্তির নামে এটি আসলে নারীর ওপর পুঁজিবাদের চাপিয়ে দেওয়া এক আধুনিক ও অমানবিক দাসত্ব।

৪. উগ্র আধুনিকতার নতুন ফাঁদ: জেন্ডার ফ্লুইডিটি (Gender Fluidity) ও ধর্ষণের সামাজিক ব্যাধি

আধুনিক নারীবাদ আজ কেবল নারী-পুরুষের অধিকারের লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এর
চরম রূপটি বর্তমান সমাজকে এক নতুন অবক্ষয় ও বিকৃতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যা প্রকারান্তরে নারীর অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ফেলছে। একই সাথে, স্বাধীনতার নামে সমাজে যে লাগামহীন অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তা নারীর ওপর সহিংসতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

ক) জেন্ডার ফ্লুইডিটির উগ্রতা ও নারীর অস্তিত্ব সংকট:

আধুনিক উগ্র নারীবাদ ও লিবারেলিজম আজ 'জেন্ডার ফ্লুইডিটি' (Gender Fluidity) বা লিঙ্গহীন সমাজের অদ্ভুত ধারণাকে উস্কে দিচ্ছে। যেখানে বলা হচ্ছে, মানুষ জৈবিকভাবে পুরুষ বা নারী হয়ে জন্মালেও সে মানসিকভাবে যেকোনো লিঙ্গ বেছে নিতে পারে। এর ফলশ্রুতিতে পশ্চিমা বিশ্বে আজ এমন এক আইন তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে একজন পুরুষ নিজেকে 'নারী' দাবি করলেই সে নারীদের শৌচাগার, নারীদের খেলার মাঠ এবং নারীদের জন্য সংরক্ষিত সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করার আইনি অধিকার পাচ্ছে। এর ফলে খোদ পশ্চিমা নারী অধিকার কর্মীরাই আজ সোচ্চার হয়ে বলছেন যে, এই উগ্র আধুনিকতা আসলে 'নারীর নিজস্ব ও অনন্য অস্তিত্বকে' সমাজ থেকে মুছে ফেলছে। একজন পুরুষ নিজেকে নারী দাবি করে নারীদের সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সব পুরস্কার জিতে নিচ্ছে, যা প্রকৃত নারীর অধিকারের ওপর এক নির্মম উপহাস। ইসলাম এই বিকৃতি থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে লিঙ্গভিত্তিক পরিচয়কে স্পষ্ট ও অলঙ্ঘনীয় রেখেছে।

খ) সামাজিক অশ্লীলতা ও ধর্ষণের মহামারী:

নারীবাদের অন্যতম বড় নীতিগত ভুল হলো তারা শালীনতা, হিজাব বা পর্দাপ্রথাকে নারীর অবদমন মনে করে এবং তথাকথিত 'উন্মুক্ত পোশাক' বা অবাদ মেলামেশাকে প্রগতিশীলতার মাপকাঠি বানায়। কিন্তু বাস্তবতা বলে, যখন একটি সমাজে শালীনতার দেয়াল ভেঙে ফেলা হয় এবং ফ্রি-মিক্সিং কালচারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়, তখন সেই সমাজ পর্নোগ্রাফির মহামারী এবং যৌন অপরাধের আখড়ায় পরিণত হয়। পশ্চিমা বিশ্বের পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অবাধ স্বাধীনতার দেশেও প্রতি সেকেন্ডে নারীরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। আমেরিকার 'রেইন' (RAINN) সংস্থার অফিসিয়াল ডেটা অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৬৮ সেকেন্ডে একজন মানুষ যৌন নির্যাতনের শিকার হন এবং প্রতি ৬ জন আমেরিকান নারীর মধ্যে ১ জন তাঁর জীবনে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। অবাধ যৌনতার এই সমাজ নারীকে কোনো সুরক্ষা দিতে পারেনি, বরং তাকে কামুক পুরুষের লালসার সহজ শিকারে পরিণত করেছে।

গ) অবক্ষয়ের জোয়ার ও সংস্কৃতির পতন:

নারীবাদ যখন পরিবারকে ভেঙে দেয় এবং মায়ের চিরন্তন মমতাময়ী রূপকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, তখন সমাজ থেকে নৈতিকতার প্রথম পাঠশালাটিই বন্ধ হয়ে যায়। একটি সন্তান যখন সুস্থ পারিবারিক পরিবেশে বাবা-মায়ের ভালোবাসা ও নৈতিক শাসন ছাড়া বড় হয়, তখন সে এক ধরণের মনস্তাত্ত্বিক শূন্যতা নিয়ে বাড়ে। এই শূন্যতাই তরুণ প্রজন্মকে পর্নোগ্রাফি আসক্তি, মাদক এবং ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধের দিকে ধাবিত করে। সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, নারীর আসল মুক্তি কোনো উগ্র উন্মুক্ততায় নেই, বরং সমাজ থেকে এই নৈতিক অবক্ষয় এবং পর্নো-সংস্কৃতির মূলোৎপাটন করার মাঝেই নারীর আসল নিরাপত্তা নিহিত, যা কেবল ইসলামী জীবনবিধানের মাধ্যমেই সম্ভব।

৫. হিজাবের মনস্তত্ত্ব: নারীর আত্মমর্যাদা বনাম পণ্যায়ন

আধুনিক সমাজ নারীকে প্রতিনিয়ত একটি দৃশ্যমান পণ্য বা অবজেক্ট (Object) হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত করে তুলেছে। এর বিপরীতে ইসলামের হিজাব বা পর্দা ব্যবস্থা কোনো সাজার নিয়ম নয়, বরং এটি নারীর মনস্তাত্ত্বিক মুক্তি ও অনন্য আত্মমর্যাদা রক্ষার এক স্বর্গীয় ঢাল।

ক) দৃষ্টির কুৎসিত কোলাহল থেকে মুক্তি:

একটি বৈরী সমাজে একজন নারীকে প্রতিনিয়ত পুরুষের লোলুপ ও কামুক দৃষ্টির মুখোমুখি হতে হয়। নারীবাদ নারীকে ঘরের বাইরে এনে এই অনিরাপদ পরিবেশের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এবং একে বলছে প্রগতি। কিন্তু ইসলাম হিজাবের মাধ্যমে নারীর চারপাশে এক অদৃশ্য ও পবিত্র দেয়াল তৈরি করে দেয়। হিজাব পরিহিতা একজন নারী সমাজকে স্পষ্ট বার্তা দেয়—"আমি কোনো প্রদর্শনের বস্তু নই যে কেউ চাইলেই আমার শরীর বা রূপ নিয়ে মন্তব্য করবে; আমার মর্যাদা আমার বুদ্ধিমত্তায়, আমার উপাধিতে এবং আমার আত্মায়।" হিজাব নারীকে পুরুষের সস্তা দৃষ্টির কুৎসিত কোলাহল থেকে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা দেয়।

খ) কর্পোরেট পণ্যায়ন ও বিউটি স্ট্যান্ডার্ডের শৃঙ্খল:

আধুনিক পুঁজিবাদ ও নারীবাদী সংস্কৃতি নারীর ওপর এক অদৃশ্য অত্যাচার চাপিয়ে দিয়েছে, যাকে বলা হয় 'পারফেক্ট বিউটি স্ট্যান্ডার্ড'। একজন নারীকে সমাজে বা কর্মক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতে হলে তাকে নির্দিষ্ট ধরণের মেকআপ করতে হবে, নির্দিষ্ট ফ্যাশনের পোশাক পরতে হবে এবং নিজের শরীরকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। এই কৃত্রিম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে গিয়ে নারীরা আজ তীব্র হীনম্মন্যতা ও মানসিক ডিপ্রেশনে ভুগছেন। ইসলাম এই পণ্যায়নকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম বলে, নারীর রূপ কেবল তার স্বামীর জন্য সংরক্ষিত, বাইরের পৃথিবীর জন্য নয়। হিজাব পরিধান করে একজন নারী পুঁজিবাদের এই কদর্য বিউটি স্ট্যান্ডার্ডের শৃঙ্খলকে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়।

গ) মর্যাদা ও আত্মসম্মানের শ্রেষ্ঠ সোপান:

সমাজ যখন কোনো মূল্যবান রত্ন বা সম্পদকে উন্মুক্ত রাখে না, বরং সেটিকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে আবৃত করে রাখে, ঠিক তেমনি ইসলাম নারীকে সমাজের সবচেয়ে দামি রত্ন মনে করে পর্দা বা হিজাবের বিধান দিয়েছে।যা একজন নারী কে পরম যত্নে আগলে রাখে। হিজাব নারীর কর্মক্ষেত্রের বাধা নয়, বরং এটি তার কাজের পরিবেশকে নিরাপদ ও পবিত্র রাখার গ্যারান্টি। এটিতেই রয়েছে নারীর সত্যিকারের মুক্তি ও স্বাধীনতার চূড়ান্ত রূপ।

৬. ইসলামে নারী অধিকার নিয়ে বিভ্রান্তি: মিডিয়া প্রপাগান্ডা ও সাংস্কৃতিক কুসংস্কার

বিশ্বজুড়ে ইসলামে নারীর অবস্থান ও অধিকার নিয়ে যত ধরণের নেতিবাচক আলোচনা শোনা যায়, সেগুলোকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এগুলোর ভিত্তি কোনো ঐশ্বরিক বিধান নয়। বরং এর পেছনে রয়েছে আন্তর্জাতিক মহলের পরিকল্পিত বুদ্ধিবৃত্তিক অপপ্রচার, স্থানীয় সমাজের ধর্মীয় অজ্ঞতা এবং কিছু পুরুষতান্ত্রিক কুসংস্কার। এই বিভ্রান্তিগুলোর মূল উৎসগুলোকে নিচে তিনটি প্রধান ভাগে চিহ্নিত করা হলো:

ক) আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের পরিকল্পিত প্রোপাগান্ডা ও দ্বিমুখী নীতি:

বর্তমান বিশ্ব-রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও পরিকল্পিত উপায়ে ইসলামের হিজাব (পর্দা), বহুবিবাহ এবং উত্তরাধিকারের আইনকে নারীর অবদমন বা শোষণের প্রতীক হিসেবে প্রচার করে। মিডিয়ার এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধকে (Information Warfare) বিশ্লেষণ করলে এক চরম দ্বিমুখী নীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পশ্চিমা গণমাধ্যম যখন হিজাব পরিহিত কোনো মুসলিম নারীকে দেখে, তখন তাকে 'শোষিত', 'অনগ্রসর' বা 'পরাধীন' বলে ব্র্যান্ডিং করে। অথচ একই পশ্চিমা সমাজ যখন একজন খ্রিষ্টান সন্ন্যাসিনীকে (Christian Nun) মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত পোশাকে দেখে, তখন তাকে শ্রদ্ধা, পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক উচ্চতার প্রতীক মনে করে। এই সুনির্দিষ্ট মিডিয়া প্রোপাগান্ডা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নতুন প্রজন্মের মনে ইসলামের নারী অধিকার সম্পর্কে এক ধরণের কৃত্রিম হীনম্মন্যতা ও বিভ্রান্তি তৈরি করছে।

খ) স্থানীয় সাংস্কৃতিক কুসংস্কার ও ধর্মের অপব্যাখ্যা (দেশীয় প্রেক্ষাপট):

আমাদের উপমহাদেশীয় সমাজব্যবস্থায় অনেক সময় আঞ্চলিক পুরুষতান্ত্রিক কুসংস্কার ও ধর্মের অপব্যবহারকে ইসলামের আইন বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, কন্যাসন্তানের জন্মের পর পরিবারে এক ধরণের অবহেলা প্রদর্শন, নারীর ওপর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন চালানো, জোরপূর্বক বাল্যবিয়ে দেওয়া কিংবা পৈতৃক সম্পত্তি বন্টনের সময় বোনদের আইনি অংশ থেকে বঞ্চিত করা। এই কাজগুলো মূলত প্রাক-ইসলামী জাহেলী সংস্কৃতির আধুনিক রূপ, যা ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলামে নারীর ওপর হাত তোলা বা তার অসম্মতিতে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। কিন্তু একশ্রেণীর মানুষ যখন নিজেদের ব্যক্তিগত বা পুরুষতান্ত্রিক স্বার্থ হাসিল করতে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দেয়, তখন সাধারণ মানুষ সেই সামাজিক জুলুমের

দায় ধর্মের ওপর চাপিয়ে দেয়। ফলে আধুনিক নারীরা বিভ্রান্ত হয়ে এক সময় নারীবাদের দিকে ধাবিত হয়।

গ) ঔপনিবেশিক মানসিকতা (Colonized Mindset) ও অন্ধ অনুকরণ:

আধুনিক সমাজের একটি বড় বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট হলো 'মানসিক দাসত্ব'। পশ্চিমা সভ্যতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে উন্নত হওয়ার কারণে, আমাদের সমাজের একটি বড় অংশ মনে করে যে—পারিবারিক, নৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোর ক্ষেত্রেও পশ্চিমা জীবনযাত্রাই একমাত্র সঠিক মাপকাঠি। প্রগতিশীল ও আধুনিক হওয়ার অন্ধ মোহে তারা কুরআন ও সুন্নাহর ভারসাম্যপূর্ণ ও সুরক্ষিত পারিবারিক কাঠামোকে 'অনগ্রসর' মনে করতে শুরু করে। তারা এই বাস্তব সত্যটি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় যে, পাশ্চাত্যের সমাজ আজ নিজের তৈরি করা চরমপন্থী মতবাদের নিচে পিষ্ট হয়ে সামাজিক ও মানসিকভাবে ধসে পড়েছে। ফলে তারা ইসলামের ঐশ্বরিক ও চিরন্তন জীবনবিধানের সৌন্দর্য না বুঝে অন্ধভাবে পশ্চিমা ধ্বংসাত্মক সংস্কৃতিকেই মুক্তির পথ হিসেবে বেছে নিচ্ছে।

৭. জেন্ডার ন্যায্যতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা: চিরন্তন ঐশ্বরিক সমাধান

পশ্চিমা নারীবাদের চরমপন্থী ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ মতবাদের বিপরীতে ইসলামের জীবনবিধান যে কতোটা বাস্তবসম্মত, তা আধুনিক জ্ঞানতত্ত্ব, অর্থনীতি এবং সমাজবিজ্ঞানের আলোকে চমৎকারভাবে প্রমাণিত। ইসলাম নারীকে পুরুষের প্রতিপক্ষ বা দাসী বানায়নি, বরং তাকে যে সর্বোচ্চ সম্মান ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়েছে, তা প্রধান তিনটি স্তরে বিশ্লেষণ করা যায়:

ক) জেন্ডার সমতার ভ্রান্তি বনাম জেন্ডার ন্যায্যতা (Gender Equity):

ইসলাম অন্ধ জেন্ডার সমতায় (Gender Equality) বিশ্বাসী নয়, বরং জেন্ডার ন্যায্যতা বা জাস্টিসে (Gender Equity) বিশ্বাসী। সমতা মানে হলো নারী ও পুরুষকে জোর করে সব ক্ষেত্রে হুবহু এক করে দেওয়া, যা প্রকৃতির নিয়মের পরিপন্থী। অন্যদিকে ন্যায্যতা মানে হলো উভয়ের শারীরিক, জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিন্নতাকে সম্মান জানিয়ে যার যার যোগ্যতা ও ফিতরাত অনুযায়ী অধিকার ও দায়িত্ব বন্টন করা। ইসলামে আধ্যাত্মিক দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিন্দুমাত্র কোনো পার্থক্য নেই; ইবাদত

ও পরকালীন পুরস্কারের ক্ষেত্রে উভয়ই সমান (সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৫)। কিন্তু সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে উভয়ের ভূমিকা প্রতিযোগী হিসেবে নয়, বরং পরিপূরক (Complementary) হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সমাজকে ভাঙন থেকে রক্ষা করে এক জান্নাতি শান্তি নিশ্চিত করে।

খ) অর্থনৈতিক দায়মুক্তি ও সর্বোচ্চ আর্থিক নিরাপত্তা:

ইসলামী আইন ও অর্থনীতির সবচেয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলাম নারীকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও ভিআইপি মর্যাদা দিয়েছে। সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থায় নারীর ওপর কোনো ধরণের আর্থিক দায় বা উপার্জনের বাধ্যবাধকতা চাপানো হয়নি। একজন নারীর জীবনের প্রতিটি স্তরে তার ভরণপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পুরুষের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। বিয়ের আগে এই দায়িত্ব বাবার, বিয়ের পর স্বামীর, এবং বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের। এমনকি বিয়ের সময় নারী যে 'মোহরানা' বা দেনমোহর লাভ করে (সূরা নিসা, আয়াত: ৪), তা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি, যেখানে স্বামী বা বাবার কোনো অধিকার নেই। একজন নারী চাইলে চাকরি বা ব্যবসা করতে পারেন, কিন্তু সেই উপার্জিত অর্থের একটি টাকাও সংসারে খরচ করতে তিনি বাধ্য নন; সেটি তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সঞ্চয়। পশ্চিমা নারী যেখানে ঘরের বাইরে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে নিজের খরচ চালাতে বাধ্য হচ্ছে, সেখানে ইসলাম নারীকে ঘরে 'রানি'র আসনে বসিয়ে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি দিয়েছে।

গ) পারিবারিক নেতৃত্ব ও সুরক্ষার ভারসাম্য কাঠামো:

ইসলাম পরিবার প্রথাকে একটি বিশৃঙ্খল ক্লাব বানায়নি, বরং এটিকে একটি সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেছে। যেকোনো সফল প্রতিষ্ঠানের মতো পরিবারেও একজন নীতিগত প্রধান বা পরিচালকের প্রয়োজন হয়, আর ইসলাম সেই বাহ্যিক দায়িত্বটি দিয়েছে পুরুষের ওপর। কুরআন বলছে, "পুরুষেররা নারীদের ওপর দায়িত্বশীল/রক্ষণাবেক্ষণকারী" (সূরা নিসা, আয়াত: ৩৪)। এই দায়িত্বশীলতা মানে কোনো স্বৈরাচারী শাসন নয়, অথচ এটি হলো নারীর জীবন, সম্মান ও নিরাপত্তার জন্য পুরুষের নিজের জীবন বাজি রাখার আইনি বাধ্যবাধকতা। ইসলামে পারিবারিক যেকোনো বড় সিদ্ধান্ত পারস্পরিক পরামর্শের (শূরা) ভিত্তিতে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে পুরুষ যেখানে বাইরের সমস্ত ঝড়-ঝাপটা ও অর্থনৈতিক চাপ সামলায়,

নারী সেখানে অভ্যন্তরীণ পরিবেশের পরিচালনা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে (সন্তান) আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার মতো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক দায়িত্ব পালন করেন। এই ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামোর কারণেই ইসলামী সমাজব্যবস্থা আজও টিকে আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমকালীন বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট ও ওহীর চিরন্তন সমাধান

১. 'ইসলামী নারীবাদ': বুদ্ধিবৃত্তিক ধর্মচ্যুতি ও গোমরাহীর আধুনিক ফাঁদ

ওহীর ওপর মানবীয় দর্শনের জবরদস্তিমূলক আধিপত্য: সমকালীন যুগে মুসলিম সমাজের সবচেয়ে সুক্ষ্ম ও বিপজ্জনক বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট হলো 'ইসলামী নারীবাদ' (Islamic Feminism)-এর ধারণাগত অনুপ্রবেশ। এর মূল চ্যুতি বা বিভ্রান্তি হলো—এটি ইসলামের নিজস্ব জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামো (Epistemology) থেকে তৈরি হয়নি, বরং এটি পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবকেন্দ্রিক দর্শনকে (Secular Humanism) সত্যের চূড়ান্ত মাপকাঠি ধরে নিয়ে, তার আলোতে ইসলামের ওহীকে বিচার করতে চায়। শরীআতের অলঙ্ঘনীয় উৎসসমূহ (কুরআন ও সুন্নাহ) যেখানে স্থান-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে চিরন্তন সত্য, সেখানে ইসলামী নারীবাদের প্রবক্তারা সাময়িক ও পরিবর্তনশীল মানবীয় দর্শনকে ওহীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতে চান। তারা দাবি করেন যে, কুরআনের আয়াতসমূহকে আধুনিক লিবারেল চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে 'পুনর্ব্যাখ্যা' বা 'ডিকনস্ট্রাকশন' (Deconstruction) করা প্রয়োজন। ওহীর অকাট্য বিধানকে মানুষের মনগড়া চাহিদার অধীনস্ত করার এই যে জবরদস্তিমূলক প্রচেষ্টা, তা মূলত দ্বীনের ভেতর এক নতুন ধরণের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকৃতি বা গোমরাহী তৈরি করছে, যা মুসলিম নারীর মন- মানসিকতা থেকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিশ্বাসকে দুর্বল করে দেয়।

হাদিস শাস্ত্রের ওপর সূক্ষ্ম আঘাত ও সুন্নাহর অবমূল্যায়ন:
ইসলামী নারীবাদের অন্যতম বড় তাত্ত্বিক কৌশল হলো রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ এবং হাদিস শাস্ত্রের প্রামাণিকতাকে সুক্ষ্মভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করা। উম্মাহর সর্বসম্মত বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থসমূহের (যেমন সহিহ বুখারী ও মুসলিম) যেসব সুনির্দিষ্ট বিবরণ বা ফিকহী সিদ্ধান্ত আধুনিক পশ্চিমা নারীবাদের 'অন্ধ সমতার' সংজ্ঞার সাথে মেলে না, সেগুলোকে তারা 'পুরুষতান্ত্রিক সমাজ দ্বারা প্রভাবিত' বলে সংশয় তৈরি করতে চায়। এটি কেবল কোনো সাধারণ আইনি দ্বিমত নয়, বরং এটি হলো দ্বীনের দ্বিতীয় প্রধান উৎস সুন্নাহর কর্তৃত্বকে (Authority of Sunnah) অবমূল্যায়ন করার এক গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক

নীলনকশা। নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসীন এবং ফকীহগণের চৌদ্দশত বছরের আমানতদারী ও কঠোর যাচাই-বাছাইয়ের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, তারা হাদিস শাস্ত্রের ওপর মনগড়া সমালোচনা ছুঁড়ে দেয়। সুন্নাহর এই অবমূল্যায়ন মূলত একজন মুসলিমকে ইসলামের প্রায়োগিক রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং প্রকারান্তরে একটি ভিত্তিহীন, খণ্ডিত ও বিকৃত ধর্মের দিকে ঠেলে দেয়।

সংশয় থেকে রিদ্দাহ: ইসলামী নারীবাদের আদর্শিক চ্যুতি ও কুফরের মানসিক ধাপসমূহ:

ইসলামী নারীবাদের এই মায়াবী ফাঁদটি একজন সরলমনা মুসলিমকে একবারে দ্বীন থেকে দূরে ঠেলে দেয় না; বরং এটি অত্যন্ত সুক্ষ্ম কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক ও আদর্শিক ধাপের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে তাকে কুফর ও রিদ্দাহ (দ্বীনত্যাগ)-এর দিকে ধাবিত করে। সমসাময়িক গবেষকদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই আত্মঘাতী রূপান্তরের প্রধান চারটি ধাপ নিচে উন্মোচন করা হলো:

১ম ধাপ—মনস্তাত্ত্বিক হীনম্মন্যতা ও ওহীর অপব্যাখ্যা (Skepticism & Apologetic Interpretation):

এই রূপান্তরের প্রথম ধাপটি শুরু হয় এক ধরণের হীনম্মন্যতা থেকে। যখন একজন মুসলিম নারী বা পুরুষ পশ্চিমা আধুনিকতা ও নারীবাদের ‘অন্ধ সমতার’ মাপকাঠিকে সত্য মনে করেন, তখন ইসলামের সুনির্দিষ্ট কিছু বিধান (যেমন: উত্তরাধিকার, হিজাব বা পারিবারিক নেতৃত্ব) তাঁর কাছে অসমঞ্জস মনে হতে থাকে। এই ধাপে সে ইসলামকে সরাসরি অস্বীকার করে না; বরং পশ্চিমা মনস্তত্ত্বকে খুশি করতে কুরআন ও সুন্নাহর টেক্সটগুলোকে জোরপূর্বক অপব্যাখ্যা (Apologetic Deconstruction) করার চেষ্টা করে এবং একে 'প্রগতিশীল ইসলাম' বা 'ইসলামী নারীবাদ' বলে সান্ত্বনা পায়।

২য় ধাপ—শরীআতের বিধানের প্রতি উষ্মা ও সুন্নাহর প্রত্যাখ্যান (Rejection of Sunnah):

যখন অপব্যাখ্যা দিয়েও আধুনিক পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে ইসলামের অলঙ্ঘনীয় আইনগুলোকে মেলানো অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন এই মতাদর্শের অনুসারীরা দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশ করে। তারা তখন সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ ও সহিহ

হাদিসসমূহকে 'পুরুষতান্ত্রিক' বা 'আরব সংস্কৃতির অংশ' বলে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করে। তারা দাবি করে, ইসলামে কেবল কুরআনের মৌলিক কিছু নৈতিক কথাই যথেষ্ট, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুনির্দিষ্ট পারিবারিক বা সামাজিক বিধানগুলো আজ আর প্রযোজ্য নয়। সুন্নাহর এই প্রত্যাখ্যান মূলত দ্বীনের অর্ধেক ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়।

৩য় ধাপ—আল্লাহর আইনকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করা (Despising the Divine Law):

এটি কুফরের সবচেয়ে বিপজ্জনক ও প্রকাশ্য ধাপ। এই স্তরে এসে ইসলামী নারীবাদের অনুসারীরা সরাসরি কুরআনের অকাট্য বিধান (যেমন: সূরা নিসার উত্তরাধিকার আইন বা বহুবিবাহ) নিয়ে ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ শুরু করে। তারা মনে করতে শুরু করে যে—চৌদ্দশত বছর আগের ওহীর এই আইনগুলো বর্তমান আধুনিক যুগের জন্য অনুপযুক্ত, অনগ্রসর এবং এতে নারীর প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। ইসলামী আকীদা অনুযায়ী, আল্লাহর কোনো সুনির্দিষ্ট চিরন্তন আইনকে ত্রুটিপূর্ণ, অন্যায় বা যুগের সাথে অমিল মনে করা এবং মানুষের তৈরি আইনকে তার চেয়ে উত্তম মনে করা সরাসরি ঈমান ভঙ্গের কারণ এবং কুফরে আকবরের অন্তর্ভুক্ত।

৪র্থ ধাপ—চূড়ান্ত রিদ্দাহ বা দ্বীনত্যাগ (Total Apostasy & Riddah):

সবশেষ ধাপে, যখন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা (Liberal Autonomy) এবং নিজের প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা ইসলামের সীমানার সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়, তখন 'ইসলামী নারীবাদ'-এর মোড়কটি সম্পূর্ণ খসে পড়ে। ব্যক্তি তখন বুঝতে পারে যে, খাঁটি ইসলামে থেকে নিজের লাগামহীন স্বাধীনতা বা পশ্চিমা এজেন্ডা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। ফলস্বরূপ, সে অত্যন্ত ক্ষোভ ও ঔদ্ধত্যের সাথে ইসলামের সামগ্রিক জীবনবিধান ও আকীদাকে অস্বীকার করে চূড়ান্ত ইরতিদাদ বা রিদ্দাহর দিকে ধাবিত হয় এবং মুরতাদ বা নাস্তিকদের সাথে হাত মেলায়।

অতএব, 'ইসলামী নারীবাদ' কোনো সাধারণ প্রগতিশীল চিন্তা নয়; এটি মূলত একজন মুসলিমকে মায়াবী প্রলোভনে ইমান থেকে কুফরের অন্ধকার অতল গহ্বরে টেনে নেওয়ার এক অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও ধারাবাহিক মনস্তাত্ত্বিক ফাঁদ।

২. সমকালীন বিশ্ব সংকট মোকাবেলায় একমাত্র পথ: 'ইজম'-এর পতন ও ওহীর শাসন

মানুষের তৈরি সামাজিক দর্শনের ব্যর্থতা ও নৈতিক দেউলিাত্ব:

মানব ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, মানবজাতি যখনই ওহীর গাইডলাইন ছেড়ে নিজের বুদ্ধি দিয়ে কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবনদর্শন (যেমন: পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা চরমপন্থী নারীবাদ) তৈরি করেছে, তা সাময়িক জাঁকজমক দেখালেও দিনশেষে মানবতাকে এক চরম নৈতিক ও সামাজিক দেউলিাত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে। মানুষের তৈরি প্রতিটি 'ইজম' বা মতাদর্শের একটি মস্ত বড় সীমাবদ্ধতা হলো, তা মানুষের নিজস্ব সংকীর্ণ স্বার্থ, আবেগ, লৈঙ্গিক পক্ষপাতিত্ব এবং স্থান-কালের সীমাবদ্ধতা দ্বারা কলুষিত। পশ্চিমা বিশ্ব আজ বিজ্ঞানে উন্নত হলেও পারিবারিক ও নৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ দেউলিয়া। তারা স্বাধীনতার নামে মানুষের আদিম ও পাশবিক প্রবৃত্তিকে আইনি বৈধতা দিয়েছে। ফলস্বরূপ, ব্যক্তি মানুষ আজ সমাজ ও পরিবারের পরম নির্ভরতা হারিয়ে এক চরম একাকীত্ব, বিষণ্ণতা, মানসিক শূন্যতা এবং আত্মহননের শিকার হচ্ছে। মানুষের তৈরি কোনো দর্শনই মানব আত্মাকে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও ভারসাম্য দিতে পারে না।

ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ ইনসাফ ও চিরন্তন ঐশ্বরিক সমাধান:

সব ধরণের মানবঘটিত কৃত্রিম মতবাদের পতন ও ব্যর্থতার পর, বর্তমান বৈশ্বিক সংকট থেকে মানবজাতিকে উদ্ধারের একমাত্র পথ হলো ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ ইনসাফ এবং খাঁটি শরীআহ আইনের শাসন। শরীআহ কোনো মানুষের তৈরি শোষণের হাতিয়ার নয়, বরং এটি মানুষের সৃষ্টি এবং ফিতরাতের পরম মহানুভব সৃষ্টিকর্তার নিখুঁত জীবনবিধান। যেখানে সমাজতন্ত্র মানুষকে রাষ্ট্রের দাসে পরিণত করে, আর নারীবাদ ও পুঁজিবাদ মানুষকে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত করে, ইসলাম সেখানে মানুষকে সমস্ত মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। শরীআতের মূল লক্ষ্যই হলো (মাকাসিদ আশ-শরীআহ)—মানুষের জীবন, বংশধারা, সম্পদ, বুদ্ধি এবং দ্বীনের সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

প্রকৃত ইসলামী শাসনের অধীনে নারী বা পুরুষ কেউ কারও প্রতিযোগী বা শোষক নয়। সেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের বন্টন কোনো অন্ধ স্লোগানের ভিত্তিতে হয় না, বরং তা হয় ঐশ্বরিক ইনসাফ ও প্রকৃতির পরম ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করে। পুরুষকে দেওয়া হয়েছে ত্যাগের মাধ্যমে সুরক্ষার গুরুদায়িত্ব, আর নারীকে দেওয়া হয়েছে মানবতার প্রথম পাঠশালা ও পারিবারিক দুর্গ পরিচালনার সর্বোচ্চ রাজকীয় মর্যাদা। সব ধরণের পার্থিব মতবাদের অন্ধকার ভেদ করে ওহীর এই চিরন্তন ইনসাফই পারে পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং আত্মিক মুক্তি ফিরিয়ে আনতে।

সপ্তম অধ্যায়

সুপারিশমালা (Recommendations)

ইসলাম ও নারীবাদের এই তীব্র আদর্শিক দ্বন্দ্বের মাঝে সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনতে এবং মুসলিম নারীদের সঠিক পথপ্রদর্শন করতে হলে নিম্নোক্ত বাস্তবমুখী ও তাত্ত্বিক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি:

- **ওহীর মূল উৎসে (কুরআন ও সুন্নাহ) প্রত্যাবর্তন:**সমকালীন সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক বিভ্রান্তি ও 'ইসলামী নারীবাদ'-এর মতো ক্ষতিকর ফাঁদ থেকে বাঁচতে হলে মুসলিম উম্মাহকে হীনম্মন্যতা ঝেড়ে ফেলে সরাসরি ওহীর মূল উৎস—পবিত্র কুরআন ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। ইসলামের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আইনগুলোকে কোনো পশ্চিমা চশমা বা মানুষের তৈরি দর্শনের আলোতে অপব্যাখ্যা না করে, সেগুলোর চিরন্তন ও ঐশ্বরিক রূপকে কোনো প্রকার সংশয় ছাড়াই হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। ওহীর জ্ঞানই সত্যের একমাত্র চূড়ান্ত মাপকাঠি—এই বিশ্বাস তরুণ প্রজন্মের মনে সুদৃঢ় করা প্রথম কাজ।
- **উলামায়ে কেরামের বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা ও প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রযাত্রা:**আধুনিক যুগের জটিল মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ বা 'ইনফরমেশন ওয়ারফেয়ার' মোকাবেলা করার জন্য হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও গবেষকদের সমসাময়িক বিষয়ে আরও গভীর ও অ্যাকাডেমিক গবেষণা বাড়াতে হবে। প্রথাগত আলোচনার পাশাপাশি পশ্চিমা দর্শন, উগ্র আধুনিকতা এবং নারীবাদের তাত্ত্বিক ফাঁদগুলোকে অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করে উচ্চতর গবেষণামূলক বই ও প্রবন্ধ রচনা করতে হবে। তরুণ প্রজন্ম যেন তাদের আধুনিক জিজ্ঞাসার জবাব সরাসরি উলামায়ে কেরামের কাছ থেকেই পায়, তেমন সহজ ও যৌক্তিক ভাষার ব্যবহার বাড়াতে হবে।
- **আইনি অধিকার সুনিশ্চিত করা ও কুসংস্কার নির্মূল:**আমাদের দেশীয় সমাজব্যবস্থায় কন্যাসন্তান বা বোনদের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার যে জাহেলী ও পুরুষতান্ত্রিক কুসংস্কার রয়েছে, তা কঠোরভাবে দমন করতে হবে। ইসলাম প্রদত্ত নারীদের উত্তরাধিকার, স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং

দেনমোহরের অলঙ্ঘনীয় আইনি অধিকারগুলোকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে। কারণ, মুসলিম পুরুষেরা যখন ইসলামের আইন অমান্য করে নারীর ওপর জুলুম করে, তখনই আধুনিক মুসলিম নারীরা বিভ্রান্ত হয়ে মুক্তির আশায় নারীবাদের ভুল পথে পা বাড়ায়।

- **গণমাধ্যমের অপপ্রচার খণ্ডন ও হিজাবের মনস্তত্ত্ব প্রচার:**আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও এনজিওগুলোর তৈরি করা ইসলামোফোবিক প্রোপাগান্ডা এবং ভুল ব্যাখ্যাগুলোর বিপরীতে ইসলামের পর্দা (হিজাব) ও পারিবারিক ব্যবস্থার মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও জৈবিক নিরাপত্তার বাস্তব রূপটি শক্তিশালী মিডিয়া এবং আইটি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হবে। হিজাব যে বন্দিত্ব নয়, বরং কর্পোরেট পণ্যায়ন ও কদর্য বিউটি স্ট্যান্ডার্ডের শৃঙ্খল ভেঙে নারীর মর্যাদা রক্ষার এক অনন্য ঐশ্বরিক ঢাল—এই চরম সত্যটি আধুনিক তরুণীদের মনস্তত্ত্বে গেঁথে দিতে হবে।

- **আদর্শ মুসলিম পরিবার গঠন ও নৈতিক পাঠশালার পুনর্জাগরণ:**একটি নৈতিকতাসম্পন্ন ও অপরাধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের প্রথম ও প্রধানতম শর্ত হলো ইসলামের সুশৃঙ্খল পারিবারিক কাঠামোকে পুনরুজ্জীবিত করা। পুঁজিবাদী পণ্যায়ন ও উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের করাল গ্রাস থেকে নতুন প্রজন্মকে বাঁচাতে হলে মায়েদের সেই চিরন্তন, মমতাময়ী ও মহিমান্বিত রূপকে ঘরে ঘরে ফিরিয়ে আনতে হবে। মা হলেন একটি সন্তানের জীবনের প্রথম এবং সবচেয়ে শক্তিশালী নৈতিক শিক্ষাকেন্দ্র। ইসলাম নারীকে ঘরের বাইরে গিয়ে সস্তা শ্রমিকে পরিণত করার চেয়ে, একটি আদর্শ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উপহার দেওয়ার মতো যে রাজকীয় ও সর্বোচ্চ সামাজিক মর্যাদা দিয়েছে—পারিবারিক পরিমণ্ডলে সেই অনন্য মূল্যবোধের চর্চা বাড়াতে হবে। তবেই সমাজ থেকে পর্নোগ্রাফির মহামারী, মাদকাসক্তি এবং ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধের শিকড় উপড়ে ফেলা সম্ভব।

উপসংহার (Conclusion)

আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে এটি অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ইসলাম ও নারীবাদের এই দ্বান্দ্বিকতা কেবল অধিকারের কোনো সাধারণ লড়াই নয়, বরং এটি মানুষের তৈরি ত্রুটিপূর্ণ কৃত্রিম মতবাদের বিরুদ্ধে ওহীর চিরন্তন ও ঐশ্বরিক বিধানের শ্রেষ্ঠত্বের অকাট্য প্রমাণ। পশ্চিমা নারীবাদ মুক্তির মায়াবী স্লোগান দিয়ে নারীর সাময়িক কিছু রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করলেও, চরমপন্থায় রূপ নিয়ে তা আজ বিশ্বব্যাপী পরিবার প্রথাকে ধুলিসাৎ করে দিয়েছে। সমসাময়িক আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান এবং সামাজিক বিপর্যয়গুলো অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে—নারীকে পুরুষের মুখোমুখি প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ সমাজকে কেবল ডিভোর্সের মহামারী, একক মাতৃত্বের মানসিক চাপ, জেন্ডার বিকৃতি এবং ধর্ষণের মতো সামাজিক ব্যাধিই উপহার দিয়েছে।

এর বিপরীতে, চৌদ্দশত বছর আগে উড্ডীন হওয়া ইসলামের ইনসাফভিত্তিক জীবনবিধান নারীকে কোনো কৃত্রিম প্রতিযোগিতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেনি। ইসলাম জেন্ডার সমতার কাল্পনিক ও প্রকৃতিবিরোধী ধারণার পেছনে না ছুটে 'জেন্ডার ন্যায্যতা' (Gender Equity) ও পারস্পরিক সম্পূরকতার এক অলঙ্ঘনীয় সমাধান দিয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের মুসলিম সমাজকে এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করতে হলে পশ্চিমা অন্ধ মানসিক দাসত্ব এবং স্থানীয় পুরুষতান্ত্রিক কুসংস্কার—উভয়কেই নিখুঁত যুক্তির মাধ্যমে সমূলে নির্মূল করতে হবে। আর তখনই কেবল ইসলামের চিরন্তন ও ইনসাফভিত্তিক সমাজকাঠামোকে পুনর্জীবিত করা সম্ভব, যেখানে নারী কোনো শোষিত পণ্য বা পুরুষের প্রতিযোগী নয়, বরং একটি শান্তিময়, সুরক্ষিত ও সুশৃঙ্খল সমাজের সম্মানিত রানি ও আদর্শ নির্মাতা।

বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ও কবি আল্লামা ইকবাল প্রাচ্যের মুসলিম নারীর এই অনন্য মর্যাদাকে ইঙ্গিত করেই তাঁর অমর লেখনীতে গভীর আক্ষেপ নিয়ে বলেছিলেন, পশ্চিমা সভ্যতা বাহ্যিক চাকচিক্য দিয়ে নারীকে হয়তো আধুনিক করতে পেরেছে, কিন্তু তার ভেতরের পবিত্র আত্মিক উজ্জ্বলতা আর মাতৃত্বের সেই স্বর্গীয় রূপকে কেড়ে নিয়েছে। তাঁর গভীর দর্শনের মূল কথাই ছিল—নারীত্বের আসল সুরক্ষাকবচ এবং মানব সভ্যতার প্রকৃত স্থায়িত্ব কোনো মানবঘটিত উগ্র মতবাদে নেই, বরং তা লুকিয়ে আছে একমাত্র ওহীর চিরন্তন আলো ও ঐশ্বরিক শৃঙ্খলার মাঝে।

তথ্যসূত্র

১.পবিত্র কুরআন

- আল-কুরআনুল কারিম

২.তাফসীর গ্রন্থসমূহ

- তাফসীরে ইবনে কাসীর — হাফিজ ইবনে কাসীর (র.)
- আহসানুল বায়ান — সালাহুদ্দীন ইউসুফ

৩.হাদীস গ্রন্থসমূহ

- সিহাহ সিত্তাহ (ছয়টি প্রধান হাদিস গ্রন্থের সমষ্টি)
- সহিহ আল-বুখারী — ইমাম বুখারী (র.)
- সহিহ মুসলিম — ইমাম মুসলিম (র.)
- জামে তিরমিযী — ইমাম তিরমিযী (র.)
- সুনানে আবু দাউদ — ইমাম আবু দাউদ (র.)
- সুনানে নাসাঈ — ইমাম নাসাঈ (র.)
- সুনানে ইবনে মাজাহ — ইমাম ইবনে মাজাহ (র.)
- আল-আদাবুল মুফরাদ — ইমাম বুখারী (র.)
  আরো অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থ।

৪.সিরাত গ্রন্থসমূহ

- আর-রাহীকুল মাখতূম — আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী
  অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সিরাত গ্রন্থসমূহ

৫.অন্যান্য আধুনিক গ্রন্থ ও সাময়িকী

- পাশ্চাত্য নারী সমাজ ও ইসলাম — মাওলানা তকী উসমানী
- ইসলামে নারীর অধিকার — ড. জাকির নায়েক
- ইসলামে নারী — আল-বাহি আল-আওয়ানী
- বিহাইন্ড ফেমিনিজম — মারিয়াম তানহা
- ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডা — বব লুইস (অনুবাদ: ফারিহা মায়মুনা)
- ইসলামে নারীর মূল্যায়ন — মুফতি হিফজুর রহমান
- নারীর শ্রেষ্ঠ পরিচয়: নানান চোখে — ড. ইয়াদ কুনাইবী
- মুসলিম নারীর সংকট — উমর সুলাইমান আল-আশকার
- ইসলামের দৃষ্টিতে কন্যার মর্যাদা — ড. ফজল ইলাহী

- মাসিক আল-কাউসার (ইসলামিক গবেষণা সাময়িকী)
  ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গবেষণা সাময়িকী।